উপন্যাস

টানাপোড়েন

জসিম মল্লিক

একটা অস্থির সময় যাচ্ছে এখন। মস্তিষ্কের কোষে কোষে এক ধরনের যন্ত্রণা সারাক্ষণ কিল বিল করছে। মস্তিষ্ক থেকে ছড়িয়ে পড়ছে দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে। সময়টা খুব খারাপ। এত খারাপ আগে কখনো আসেনি। ঘরময় লোকজন বসে আছে তার মধ্যেই মাথা গুজে কাজ করে যাচ্ছে রেজাউল করিম। যন্ত্রের মতো হয়ে গেছে মানুষটা। লোকজনের দাবি দাওয়ার যেনো শেষ নেই। সবার শুধু চাই আর চাই।

সাত সকালে যে এসে বসেছে চেয়ারে রেজাউল এখনো বসেই আছে। মাঝে দু' একবার মাত্র উঠে হয় টয়লেটে গেছে না হয় সিগারেট ফুকেছে। একঘেয়ে হয়ে উঠেছে জীবনটা। প্রতিদিন প্রচন্ড এক টেনশন নিয়ে ঘুম ভাঙছে এবং একই টেনশন নিয়ে ঘুমোতে যাচ্ছে। কোনো ছুটি নেই, কোনো অবসর নেই। মাঝে মাঝে ভাবে রেজাউল এই কি জীবন! জীবন কি এতই কঠিন।! মানুষ হয়ে জন্মানোর সার্থকতা কোথায়? আজ চারদিকে শুধু অন্ধকার দেখতে পাচ্ছে। এ রকম একটা জীবন কখনো কাম্য ছিল না। রেজাউল চেয়েছিল নির্ঝঞ্ঝাট সাদা সিধে একটা জীবন। অথচ হয়েছে তার উল্টোটা। প্রতি মুহূর্তে ঝামেলাযুক্ত কাজে জড়িয়ে যাচ্ছে। এতো টেনশন নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে!

রেজাউল যখন একা হয় তখন অনেক ভাবনা ভীর করে। আজকাল এমন হয়েছে অহেতুক বুকটা ভার হয়ে থাকে। বুকের ধুকপুকানি কিছুতেই যেতে চায় না। চারদিকে অন্ধকার দেখে। মস্তিষ্কের কোষে কোষে যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ে। ভাবে জীবনের মুক্তি কোথায়! উপায় খুঁজে পায় না। এরচেয়ে মুক্তিই কি শ্রেয় নয়? এক অন্ধকার গহ্বরে যেনো প্রতিমুহূর্ত ডুবে যাচ্ছে রেজাউল। চারদিকের পৃথিবীটাকে খুব স্বার্থপর, লজ্জাহীন মনে হয়। আপন মানুষের বড় অভাব। কোথায় আশ্রয় নেই, শান্তনা নেই। কঠিন এই পৃথিবীতে রেজাউল নিজেকে বড় অসহায় বড় একাকী একজন মানুষ মনে করে।

বস কিছুক্ষণ আগে চলে গেছেন। রাত আটটা হয়ে গেছে। সকাল নটায় অফিসে ঢুকেছে রেজাউল। লোকজন বিদায় করতে করতে আরো ঘন্টা দুয়েক লেগে যাবে। টেবিলে স্তুপ হয়ে আছে ফাইল। সবাই চায় তার কাজটা আগে হোক। রেজাউলের বস এমন একজন মানুষ যিনি প্রতি মুহূর্তে মানুষকে তটস্থ রাখতে পারেন। টেনশন ছড়িয়ে দিতে পারেন। তিনি যেমন পরিশ্রমী, কাজ ভালোবাসেন তেমনি কাজ আদায়ও করে নিতে পারেন। সত্যিকার অর্থে রেজাউলের বস একজন সফল মানুষ। তারপরও মানুষের কিছু অপূর্ণতা থাকে। সেই অপূর্ণতা কখনো কখনো কত যন্ত্রণার আর ভয়ঙ্কর হতে পারে রেজাউল তা ওর বসের মধ্যে দেখেছে। এই অপূর্ণতার যে উত্তাপ তা রেজাউলকেও পুড়ে খাক করে দিচ্ছে। যেনো এক নরক কুন্ডে বসবাস করছে রেজাউল।

ঘরে ফিরে রেজাউলের কিছুই ভালোলাগে না। অফিসের গাড়ি নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। পরদিন সকাল ঠিক সাড়ে আটটায় গাড়ির হর্ণ শোনা যাবে। গাড়ি আসতে একদিনও ভুল হয় না। দৌড়ঝাপ করে রেজাউলকে বেড়িয়ে পড়তে হয়। মাঝে মাঝে এও ভাবে ওর কঠিন কোনো অসুখ হোক। কয়েক মাস বিছানায় পড়ে থাকুক। তখন বস বিরক্ত হয়ে চাকরি থেকে আউট করে দেবে। এ রকম হলে যেনো রেজাউল বেঁচে যায়।

রেজাউলের শুকনো মুখ দেখে ওর স্ত্রী ঝর্নার তেমন কোনো ভাবান্তর হয় না। ঝর্না বুঝতে পারে তার স্বামী খুব সুখে নেই। চাকরিটা ভালোই কিন্তু রেজাউলের জন্য তা বড়ই বেমানান। রেজাউলের চাকরিটা তাদের জন্য বড়ই উপাদেয় ও আকর্ষণীয় যারা দুই নম্বরী করতে পারবে, মানুষকে ঠকাতে পারবে, কষ্ট দিতে পারবে, রেজাউল এসব কিছুই পারে না। পারে না বলেই চাকরি নিয়ে ওর কষ্টের কোনো অন্ত নেই।

একযুগ ধরে রেজাউল এই চাকরি করছে। আজকাল কোনো ক্ষেত্রেই পরিশ্রম ও সিনসিয়ারিটির তেমন কোনো মুল্য নেই। ফাঁকিবাজ বা অসৎ লোকদের সমাজে খুবই কদর। লোকজন তাদের খাতিরও করে। রেজাউল অতিরিক্ত সিনসিয়ার বলে এই কাজে ওকে দরকার, কিন্তু মুল্যায়ন তেমন নেই। মোটামুটি পরিশ্রমের জীবন রেজাউলের।

টেবিলে যখন খেতে বসলো তখন ঘড়িতে এগারোটা। যত রাতই হোক ঝর্ণা ওর জন্য বসে থাকবেই। এ যুগের মেয়ে হয়েও ঝর্না স্বামীর জন্য খাবার নিয়ে অপেক্ষা করে। ঝর্ণা বড়লোকের মেয়ে। আরাম আয়েসে বড় হয়েছে। কিন্তু স্বামীর সাধারণ জীবন সে মেনে নিয়েছে। এসব নিয়ে তার তেমন কোনো অভিযোগ নেই। অভিযোগ যেটা সেটা অন্য। চাকরি নিয়ে রেজাউল যে সন্তুষ্ট নয় ঝর্ণা তা জানে। তারপরও ওরা ভাগ্য বলে সব মেনে নিয়েছে। ঝর্ণার অভিযোগ হচ্ছে অন্য আর দশজনার মতো তার স্বামী কেনো সবকিছু সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। অন্যের অধীনে কাজ করতে হলে সব কিছু মেনে নিয়েই করতে হবে।

অতি সাম্প্রতিক মাসগুলোতে রেজাউল খুব মুষড়ে পড়েছে। অপ্রয়োজনীয় কিছু কাজের চাপে নাভিশ্বাস উঠছে ওর। লম্বা চওড়া সুন্দর মানুষটা কেমন যেনো হয়ে গেছে। ওজন কমে গেছে, গাল বসে গেছে ভেতরে। অসুস্থ মানুষের মতো মনে হয়। কথা বার্তা একদমই বলে না। বারো বছর চাকরির বয়স হলেও এতোটা খারাপ অবস্থা আগে ছিল না। খাবার টেবিলে দু' একটা কথা হয় মাত্র। বিছানায় দু' জন দুদিকে ফিরে ঘুমিয়ে যায়। ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হয়। ঘুমের ওষুধের সাইড এফেক্ট হয়। বুকে ধুক পুকানি নিয়ে ঘুম ভাঙে। চাকরি যেনো এক আতঙ্কের নাম।

॥ ২ ॥

অফিসে ঢুকতেই ফোন বেজে উঠলো। বসের কলিং বেল এবং ফোন এ দুটোই যেনো এক শঙ্কার নাম। বুকটা ধ্বক করে ওঠে। কি যে হয়েছে রেজাউলের। চারিদিকে শুধু আতঙ্ক ছড়ানো। এত আতঙ্ক ছড়িয়েছে বসের অপূর্ণতা। তার জীবনের ভুলের খেসারত। ফোনটার

দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকাল রেজাউল। বস মানুষটা অদ্ভুত। সকাল থেকেই তিনি যেনো এক আগুনে পোড়া লোহার কড়াই। সবাইকে যেনো ঝলসে দেবেন। পুড়ে ছারখার করে দেবেন। একজন বলেছিল বসের কলিংবেল যেনো ইসরাফিলের সিঙ্গা। না, বসের ফোন নয়। ফোনটা আতাউর রহমানের। রেজাউলের জুনিয়র বন্ধু। কমপক্ষে দশ বছরের ছোট। অথচ চমৎকার বন্ধুত্ব। ছোটখাটো ফর্সা টগবগে তরুণ। অসম্ভব বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। কাজেও খুব পটু। পাকনা কথায় ওস্তাদ। রেজাউল যখন ভালো মুডে থাকে তখন সব প্রিয় লোকদের দোস্ত বলে সম্বোধন করে।

- কি দোস্ত, সাত সকালে কি মনে করে!

- এমনি। কেমন আছেন খবর নিতে।

- একই রকম। খুব অশান্তির।

- শুনুন রেজা ভাই অশান্তি মনে করলেই অশান্তি। জীবনটাকে সহজভাবে নিন। কোনো কিছুকেই এত সিরিয়াসলি নেয়ার কিছু নেই। বি ইজি।

-তুমি কোথায়!

- বাসা থেকেই।

- কাজ কি আজ।

পত্রিকা অফিসে যাবো। কপি দিতে হবে। টাইম মতো না দিলে তো আপনার বকা খেতে হবে।

রেজাউল একটা পত্রিকার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এখন একদম সময় দিতে পারে না। আতাউর ওর কাজটা করে দিচ্ছে। বড় কথা হচ্ছে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত থাকা। রেজাউল কোনোদিন এরকম একটি স্বাধীনতাহীন চাকরি করতে চায়নি। মানুষের চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে যে দুস্থর ব্যবধান তা আজকাল বুঝতে পারে। মানুষ নিজেকে নিজের মতো করে গড়ে তুলতে পারে না। রেজাউল তার বসকে দেখেও আজকাল তা বুঝতে পারে। বস চিরদিন অনেক কিছুই নিজের ইচ্ছে মত হওয়াতে পেরেছে। কিন্তু জীবন পরিপূর্ণ নয়। অনেক অপূর্ণতা আর অসম্পূর্ণতা জীবনের স্বাভাবিক গতিকে বাধাগ্রস্থ করে। বসের ক্ষেত্রেও এখন তাই হয়েছে। তবে কারো জীবনেই খারাপ সময়গুলো চিরস্থায়ী নয়। রেজাউল চেয়েছিল লেখালেখি করবে, নাম হবে, তেমন কোনো গুরু দায়িত্ব থাকবে না। অত বেশি বেশি জবাবদিহীতাও নেই। প্রতি পদক্ষেপে ধমক খেতে হবে না। ভুল বোঝাবুঝি থাকবে কম কম এরকম একটি জীবন। কিন্তু তা হয়নি। তবে এত কিছুর মধ্যেও রেজাউল লেখালেখির সংশ্রবটা ছাড়েনি। ও নিশ্চিত জানে একদিন ঠিক লেখালেখির জগতে ফিরে আসবে। আতাউর এ ব্যাপারে ওকে খুবই সহযোগিতা করছে। আতাউর সৎ ছেলে। রেজাউলের প্রিয় মানুষদের একজন।

- পত্রিকা অফিসে যাওয়ার সময় আমার এখানটা হয়ে যেও।

- আপনার অফিসে যেতে ভালো লাগে না। ওখানে বেশিক্ষণ থাকলে ক্রিয়েটিভিটি নষ্ট হয়।

- তা অবশ্য ঠিক বলেছো। তবুও একবার এসো। দরকার ছিল।
- ঠিক আছে আসবো।
- তোমার কি ইউনিভার্সিটি বন্ধ!
- বন্ধ নয় তবে ক্লাস হচ্ছে না।

ফোন রেখে দিল আতাউর। আতাউরের সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তা বলতেও রেজাউল এনজয় করে। আতাউরের প্রতি খুব একটা মায়া পড়ে গেছে। আতাউরের একটা ডাক নাম আছে বাবু। বাবুর ফ্যামিলিটা বেশ ভালো। সবার মধ্যে ওই ছোট। একমাত্র ছেলে। রেজাউলের সঙ্গে পরিচয় লেখালেখির সূত্র ধরেই। তারপর থেকেই রেজাউলের সঙ্গে লেগে আছে। রেজাউলের পত্রিকার কাজগুলোর অনেকখানিই ও সামলায়।

বসের অফিসে আসতে আজ একটু দেরি হবে। ভিসিটরে ভরে গেছে। নানা ধরনের তদবির, ধান্দাবাজি, ফন্দিফিকির এসবই বেশি। বস কাজের মানুষ। পরিশ্রম ও সততার জোরে অনেক উপরে উঠে এসেছে। আজ লোকজনের সঙ্গে বেশি কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না। মাথাটা কাজই করছে না। আবার কথা না বললেও বিপদ। সবাই চায় রোজউল শুধু দাত বের করে হাসুক। তার যেনো আর কোনো কাজ নেই। সবার ফন্দি ফিকিরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাও। এসব না করলেও বিপদ। অভিযোগ যাবে বসের আছে। ভালো ব্যবহার বা সহযোগিতা না করার অভিযোগ। রেজাউলকে চাকরি থেকে বের করে দেয়ার ষড়যন্ত্র হর হামেশাই হচ্ছে। অভিযোগের কোনো শেষ নেই। এসব সত্ত্বেও রেজাউল দশ দশটি বছর টিকে আছে। বস অন্যের কথা শোনেন ঠিকই তারপরও তিনি সত্যিটা বোঝেন। রেজাউলের একটাই সমস্যা সে নিজে থেকে চাকরি থেকে চলে আসতে পারছে না। তাকে বাদ দেয়া হলে সে সত্যিকার খুশি হবে। এটার জন্যেই সে অপেক্ষা করছে।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে বাবু এলো। বাবুকে এ অফিসের অনেকেই চেনে। হাসিখুশি বাবুকে অনেকেই পছন্দ করে।

- চা খাবে।
- অবশ্যই। না বলতে শিখিনি।
- অন্য কিছু।
- রেজা ভাই বলেছি না যা দেবেন তাই খাবো। এমনকি বিষও।
- ওটা দরকার আমার।
- আপনি ওটা খেয়ে কি করবেন। আপনার স্ত্রী আছে সন্তান আছে।
- একটা কাজ করলে কেমন হয়।
- কি!
- দেশ ছেড়ে পালালে।
- পারবেন না।
- কেনো পারবো না!
- আপনাকে আমি জানি, আপনি একা কোথাও থাকতে পারবেন না।

- আমি আসলে একটু অদ্ভুত না!
- খুবই ।
- অথচ জানো আমার বস খুবই প্রাকটিক্যাল মানুষ । ইমোশনের ধার ধারেন না ।
- এজন্যেই তিনি এত বড় হয়েছেন । আমার অবাক লাগে আপনি এতগুলো বছর কি করে তার সঙ্গে কাটালেন ।
- আমিও অবাক হই ।
- যাই হোক কি জন্যে ডেকেছেন তাই বলুন ।
- এমনি । দু' তিন দিন আসো না তাই । খোঁজ খবর নাও না ।
- বলেছি না আপনার এখানে এলে ক্রিয়েটিভিটি নষ্ট হয় । কদর্য পরিবেশ ।
- জানো বাবু সময়টা খুব খারাপ ।
- কিছু খারাপ নয় । যার যা খুশি করুক । আপনার কি আসে যায় । সবকিছুতে নিজে জড়িয়ে পরবেন না । সহজভাবে নিন । জীবন অনেক সুন্দর ।
- বয়সটা তো কম । বুঝতে পারছো না ।
- খুব বুঝতে পারি । চোখ কান তো খোলাই নাকি! আপনি বরং অনেক কিছু বোঝেন না । শুধু শুধু কষ্ট পান । চলি রেজা ভাই ।
- ওকে । রাতে বাসায় ফোন করবো ।
- আচ্ছা ।

॥ ৩ ॥

হঠাৎ করেই সপ্তাহখানেকের ছুটি পাওয়া গেলো । এ যেনো মেঘ না চাইতেই জল । বস মেডিক্যাল চেক আপের জন্য বিদেশ চলে গেছেন । রেজাউল একদমই সময় নষ্ট করলো না । দ্রুত টেলিফোন করে রকেট সার্ভিসে একটি প্রথম শ্রেণীর কেবিন বুক করে ফেললো । এবং স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে চড়ে বসলো । খুলনা যাবে । খুলনা রেজাউলের খুব প্রিয় জায়গা । জন্মস্থান । ঢাকা শহরটা যেনো এক নরক । কেনো যে মানুষ ছুটে আসে এখানে কে যানে । যন্ত্রণা ছাড়া আর কি আছে ।

রেজাউলের সন্তানরা খুব খুশি । একেবারে আত্মহারা । রকেটের খোলামেলা পরিবেশ রেজাউলেরও ভালো লাগে । ওরা খেলছে । খাচেছ । দৌড়াদৌড়ি করছে । রেজা মুগ্ধ হয়ে দেখে । ওদের জন্যই তো সব । না হলে কবেই সব ছেড়ে ছুড়ে দিত । দু'জনই ভালো স্কুলে পড়ে, পড়াশোনায়ও ভালো । ঝর্ণা নিজেই পড়ায় । সেও ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করা মেয়ে ।

রাত দশটায় রকেট চাঁদপুর এসে থেমেছে । এখানে ঘন্টাখানেক থাকবে । লোকজন উঠানামা করছে । মেঘনা নদীর এই অংশটা খুব ভাঙছে । শহর রক্ষাই সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে । বাইরে বেশ ঠান্ডাও পড়েছে । রেজাউল অন্ধকার নদীর দিকে তাকিয়ে আছে । হাতে জ্বলছে সিগারেট । ওর জীবনটা কেনো যে এরকম হলো! বছর পাঁচেক আগে একবার এরকম

দুঃসময় এসেছিল। আসলে জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা দুঃখ বলে কিছু নেই। দুটোর সংমিশ্রণই জীবন। কিন্তু মন বড় অবুঝও। অনেক কিছুই মন বুঝতে চায় না। এরকম এক পরিস্থিতিতে রেজাউল একবার চাকরি ছেড়েছিল। দু' মাস চাকরির বাইরে থেকেছিল। আবার একই চাকরিতে ফিরতে হয়েছে। বড়ই দুর্ভাগ্য। আবার না ফিরলেও কি অনিশ্চয়তায় পড়তে হতো তাও জানা ছিল না। অনিশ্চয়তার বড় ভয়। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস বড় কম। সেবার চাকরি থেকে রিজাইন করার সাহস অন্তত হয়েছিল। এবার তাও পারছে না। বস কিভাবে নেবে সে ভয় তো আছেই উপরন্ত সন্তানদের কি হবে! ওদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই রেজাউল চোখে শুধুই অন্ধকার দেখছে।

বাইরে ঠান্ডা খুব বেড়েছে। রুম ঢুকে শুয়ে পড়লো। রকেটের দুলুনিতে ঘুম এসে গেলো। পরদিন সন্ধ্যায় ঘাটে পৌঁছলো রকেট। গাড়িও এসে গেছে। রেজাউল সংসারে সবার ছোট। বড় ভাই গাড়ি পাঠিয়েছে। পুরো এক বছর পর এলো রেজাউল। রেজাউলদের বিশাল বড় বাড়ি। অনেক আত্নীয় স্বজন। খোলা মেলা জায়গা। বড় বড় পুকুর। খেলার মাঠ, তড়িতরকারির বাগান, ঘন জঙ্গল, চাষের জমি এসব যেমন আছে তেমনি আছে আধুনিক সব সুযোগ সুবিধা। রেজাউলের ভাইদের অবস্থা ওর চেয়েও ভালো। একমাত্র রেজাউল একাই পরবাসী হয়েছে। রেজাউল আজ বুঝতে পারছে এই সুন্দর প্রিয় শহর ছেড়ে যাওয়া ওর উচিত হয়নি। বড় ভুল হয়ে গেছে। অনেকেই ঢাকার মায়ায় পড়ে যায়। রেজাউল কখোনোই ঢাকার সঙ্গে আত্তস্থ হতে পারেনি। ভার্সিটির পড়াশোনা শেষ করে আর ফেরা হলো না। যদি ঝর্নার সঙ্গে পরিচয়টা না হতো তাহলে হয়তো ফেরা হতো। জীবনটা হতে পারতো অন্য রকম।

সন্তানদের ছেড়েও রেজাউল কোথাও থাকার কথা ভাবতে পারে না। চেষ্টা করে দেখেছে সম্ভব হয়নি। এত মায়া কোথা থেকে আসে। এখন চেষ্টা করছে সবাই মিলে এদেশই ছেড়ে দেবে। দেখবে দেশ ছেড়ে শান্তিতে থাকা যায় কিনা। কতজনই তো পরবাসী হয়েছে। সন্তানই তো সব। ওরা সঙ্গে থাকলে আর ভয়কি।

বাড়িতে এসে মা ভাইবোনদের সঙ্গে দেখা হয়ে মনটা একটু হালকা হলো। মাকে সব বললো। মা অনেক শান্তনা সাহস ও দোয়া দিলেন। বললেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে দুরুদ পড়তে। একমাত্র আল্লাহই পারেন মানুষকে সব মুস্কিল থেকে আসান করতে। ভাইবোনদের বললেন মনের কষ্টের কথা। সবাই শান্তনা দিলেন। স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে সবকিছু। এমনকি ঝর্নাও যে এসব বিষয় নিয়ে বেশি কথা বলে না, সেও বললো-

- তোমার হয়েছেটা কি বলতো!

- বুঝতে পারি না।

- তোমার কাজ চাকরি করা, তুমি চাকরি করে যাও। বসের সমস্যা বসই ফেস করবে। এটার জন্য তোমার এতো পেরেশানির কি আছে !

ঝর্নার কথাটা সত্যি। তারপরও রেজাউল পারে না। বসের মানসিকতা খারাপ থাকলে ওর ওপর ভীষণ চাপ পড়ে। গালাগালি খেতে হয়। ভুল বোঝাবুঝি হয়। এত চাপ নেয়ার মত মানসিকতাই রেজাউলের তৈরি হয়নি।

- তোমার কথাই ঠিক। তবুও।

রেগে গিয়ে ঝর্ণা বলে, তবুও কি। এসব নিয়ে একদম মাথা ঘামাবে না। চাকরি করলে এরকম হবেই। চাকরি কোনো আরামের জিনিস নয়। আর সবকিছু নিজের ইচ্ছে মতো হয় থা।

রোজাউল আর কথা বাড়াতে সাহস পায় না। চেষ্টা করে স্বাভাবিকভাবে নিতে। আল্লাহকে ডাকে। বাড়িতে এসে একটু ভালো লাগলেও আতঙ্ক কাটে না। সকালে এখনো ঘুম ভাঙে বিষাদ নিয়ে।

পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে ভালোই লাগে। দেখতে দেখতে ছুটি শেষ হয়ে যায়। এবার ফেরার পালা। আবার যুদ্ধ। আবার নোংরামি। আবার টেনশন। এর কি কোনো শেষ নেই! দুঃখের দিনগুলো কেনো যে এতো প্রলম্বিত হয়। রেজাউল মনে মনে নিশ্চিত হয়ে ফের ঢাকায় পা রাখলো তা হলো একদিন ঠিক সে এ দেশকে গুডবাই জানাবে।

॥ ৪ ॥

আতউর রহমান কলকাতা গেছে। দুলাভাইকে চিকিৎসা করাতে হবে। ছোট মানুষটার দ্বায়িত্বের যেনো শেষ নেই। নিজের পড়াশোনা ছাড়াও দৌড়ঝাপ লেগেই আছে। রেজাউলের হাতে আরো দু'দিন সময় আছে।পরশুদিন বস ফিরবে দেশে। বস ফেরা মানে রেজাউলের নাভিশ্বাস। নানা ধরনের প্রটোকল। ভেবেছিল এ দু'দিন ঢাকার বন্ধুদের সময় দেবে কিন্তু তা হচ্ছে না। বাবু যে কবে ফিরবে কে জানে। চিকিৎসার ব্যাপার। ওর দুলাভাইয়ের লিভারের সমস্যা। এ্যালকোহলের আধিক্যে লিভার জটিল আকার ধারণ করেছে। বাবু নেই, পত্রিকার কাজ করবে টা কে! নিরুপায় হয়েই দুপুরের দিকে গেলো পত্রিকা অফিসে। ওর কলিগরা ঘিরে ধরলো। অনেকদিন পর আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেলো সারা মনে প্রাণে। দীর্ঘদিন এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত। যখনই আসে ভালো লাগে। গল্প আর আড্ডার ফাকে ফাকে নিজের কাজ করে যাওয়া। অসাধারণ পারিবারিক পরিবেশ। সাংবাদিকতার অনিশ্চয়তার কথা ভেবে প্রাইভেট চাকরিতে ঢুকেছিল। শুধুমাত্র জীবন ধারণের জন্যই। কিন্তু জীবন ধারণ যে এতোটা কষ্টকর হবে বুঝতে পারেনি। রেজা কখনোই চাকরি নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তবুও দশ দশটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। যদিও সাংবাদিকতা এখন আর অনিশ্চয়তার কাজ নয়। অনেকেই বহাল তবিয়তে চাকরি করে যাচ্ছে। আসলে মানুষ যা চায় তা পায় না।

দোস্ত কেমন আছেন! একজন জুনিয়র কলিগ জিজ্ঞেস করলো। রেজাকে এ অফিসের সবাই দোস্ত সম্বোধন করে। 'দোস্ত' শব্দটা রেজারই আবিস্কার।

- ভালো নেই দোস্ত!

- কেনো! এতবড় লোভনীয় চাকরি তাও বলছেন ভালো নেই!

- খুব অশান্তিতে আছি। মানসিক টেনশন। আর একজন কলিগ শরিফ বললো, খুব শুকিয়ে গেছেন। একদম চেনাই যায় না। আপেলের মত চেহারা কি হয়েছে। ডায়াবেটিস হয়নি তো! কেউ অসুস্থতার কথা বললে রেজার মন খারাপ হয় আরো বেশি।

- কি জানি! চেক আপ করাতে হবে। সময়ই তো পাই না।

- অতো টেনশন করে লাভ নেই। কি হবে বলেন! নিজেকে নিশ্বেস করে দিয়ে কি লাভ! বললো রফিক।

- ঠিকই বলেছো। কোনো লাভ নেই। কিন্তু অন্যদের মতো পারি না।

- পারতে হবে রেজা ভাই। আপনি খেটেই গেলেন। নিজের সন্তান সংসারের প্রতি খেয়াল রাখুন। লেখালেখিটা ছেড়ে দিয়েন না। অফিসে আসুন মাঝে মাঝে ভালো লাগবে।

ঘন্টা দুয়েক গল্প করে এবং টুকটাক কাজ সেরে রেজা চলে এলো মোঃপুরে। এখানে কানাডার ইমিগ্রেশনের একটা ল ফার্ম আছে। একটু খোঁজ খবর নেয়া দরকার। মাস কয়েক হলো অ্যাপ্লাই করেছে রেজা ইমিগ্রান্ট হওয়ার জন্য। অনেক ঝামেলা করে কাগজপত্র তৈরি করতে হয়েছে। প্রচুর ডকুমেন্টস দরকার হয়। তখন পেরেছিল। এখন যে অবস্থা যাচ্ছে কিছুতেই সম্ভব হতো না। রেজা জানে আজকের এই মানসিক বিপর্যয় একদিন কেটে যাবে। আল্লাহই রহমত করবেন।

অফিসে এসে যা শুনল তাতে রেজার মাথায় হাত। ওর ফাইল চলে গেছে নিউ দিল্লি। ওর রিকয়েরমেন্ট ছিল আমেরিকা। দিল্লিতে প্রচুর সময় লাগে। রেজার অত ধৈর্য্য নেই। ওর এক আত্মীয় বাশার ভাই ফ্যামিলী নিয়ে চলে যাওয়ার পরই ওর মধ্যেও প্রচন্ড আগ্রহ জাগে ইমিগ্র্যাট হওয়ার। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা বিবেচনা করে দরখাস্ত করে ফেলে। গত দু' তিন মাস কোনো যোগাযোগ না রাখায় এই সমস্যাটা হয়েছে। রেজা ওদের জনসংযোগ কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করতে ঢুকলো। সৌভাগ্য বশত ওদের বস এখন দেশেই। তার রুমে ঢুকলো। আপনার দযে ছেলেটা রেজার ফাইল তৈরি করেছিল সে চলে গেছে অস্ট্রেলিয়া, ফলে রেজা জবাব দিহিতাও চাইতে পারছে না। তারই ভুলে এই বিপত্তি।

- আসুন।

লম্বা চওড়া ফর্সা মানুষটি। চোস্ত ইংরেজি বলেন। অনেকদিন থেকে কানাডায়। দু' মাস পরপর দেশে আসেন। আরো বেশি বেশি লোক কানাডা যাক তিনি তাই চান। এজন্যেই খুলে বসেছেন ল ফার্ম। আইনগত সহায়তা দেন। অনেকে গেছেও কানাডা। ব্যবসাটা ভালো। প্রচুর লাভ। ফুলে ফেপে উঠলে ল' ফার্ম।

রেজা বসলো মুখোমুখি। মুখটা গম্ভীর। এমনিতেই অশান্তি তার ওপর দুঃসংবাদ।

- চা না কফি।

- একটা হলেই হয়।

- আপনি আমেরিকায় ইন্টারভিউ দিতে চান!

- হ্যাঁ।

- ভিসার ব্যাপারটা কিন্ ায়িত্ব।

- জানি।

- আর একটা কথা বলি। আমেরিকার চারটি স্থানে ইন্টারভিউ হয়। নিউইয়র্ক হলে সর্বনাশ।

- চারটি কোথায়?

- নিউইয়র্ক, সিয়াটল, লসএঞ্জেলেস, শিকাগো।

- ভালো কোথায়।

- এল এ তে

- এটা চাইতে পারি না?

- পারেন, তবে নাও দিতে পারে। আপনি বললে ফাইল ট্রান্সফার করে দিতে পারি।

- তাই দিন। ক' মাস পিছিয়ে গেলাম।

-একটু ভেবে দেখুন।

- ঠিক আছে। কয়েকদিন পর জানাবো। আচ্ছা আমেরিকা হলে কতদিনে ইন্টারভিউ হতে পারে।

- ফাইল ট্রান্সফার হলে বারো থেকে পনেরো মাসের মধ্যে।

- তাহলে তো খুবই কম সময়।

- সবাই তো আর আমেরিকা যেতে পারে না। আপনি সিওর যে ভিসা পাবেন।

- দেখা যাক। আমি জানাবো। কয়েকদিন সময় নিলাম।

ইমিগ্রেশন অফিস থেকে বের হতে না হতেই মোবাইল বেজে উঠল। রেজার ক্লোজ ফ্রেইন্ড মজনুর ফোন।

- দোস্ত কোথায়!

- এই তো মোঃপুর

- আমরাও ধানমন্ডি। ভিনটেজে।

- খাচ্ছিস!

- না, এখনো অর্ডার দেইনি।

- আর কে কে!

- তুই চলে আয়!

- আসছি।

ভিনটেজে ঢুকে দেখলো এলাহি ব্যাপার। মজনু, কামাল, প্রদীপ, ডেভিড, শফিক সবাই। ওরা সবাই রেজার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রেজাকে জড়িয়ে ধরলো। রেজা সব কষ্ট ভুলতে চেয়েও পারছে না। কালই ওকে নরকে ঝাপিয়ে পড়তে হবে এটা মনে হলেই মনটা বিষাদে ভরে যায়। আনন্দটাও ঠিকমত উপভোগ করা যায় না।

- তোর একি হাল হয়েছে।

- টেনশন। অশান্তি।

কামাল বললো, জীবনটাকে স্বাভাবিভাবে নিবি শালা। তুই চাকরি করছিস ব্যস। অন্যের সমস্যা তুই কাধে নিবি কেনো! তোকে একটা বই দেবো। ওটা পড়বি। কোরআনের আয়াত। মনটা ভালো হবে।

॥ ৫ ॥

রেজাউলের অবিশ্বাসে চির ধরেছে। পর পর ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনায় রেজা এক ভীতির মধ্যে বসবাস করছে। যে মানুষটির সঙ্গে দীর্ঘদিন এতো সহজ সম্পর্ক ছিল তাকেই এখন রেজা যম মনে করে। তার কথা ভাবলেই আতকে ওঠে। আগে যার একটি শক্ত কথা সহজভাবে নিতে পারতো এখন পারে না। একটু উচ্চস্বরে কথা বললেও বুকটা কেঁপে ওঠে। কেনো যে এমন হচ্ছে বুঝতে পারে না। যাকেই এ সমস্যার কথা বলেছে সেই বলছে স্বাভাবিকভাবে নিতে। কিন্তু কিছুতেই রেজা নিজেকে বোঝাতে পারে না। অবুঝ মন কিছুই বুঝতে চায় না। এ রকম মানসিক বিপর্যয় একটানা বেশিদিন থাকলে কোনো অঘটন ঘটে যেতে পারে।

বসকে কেন্দ্র করে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যা ছিল রেজাউলের ইচ্ছের বাইরে। যখনই রেজার ইচ্ছের বাইরে কিছু ঘটে সেটা রেজা সহজে মেনে নিতে পারে না। সমর্থনও নয়। এসবের একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবও ওর মধ্যে থেকে যায়। এখন রেজার মধ্যে যা হচ্ছে তা হলো সেই প্রভাবের বিষক্রিয়া। মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ছে বিষ। বুকটা অহেতুক ধরফর করে। মাথায় রক্তের চাপ বেড়ে যায়। কি যে একটা ভুতুরে অবস্থা। চাকরির প্রতি ঘৃণা ধরে গেছে। স্ত্রী সন্তানদের কথা ভেবে ছাড়তেও পারছে না। এসবের অনেক আগেই রেজাউল কানাডায় অ্যাপ্লাই করেছিল। এখন বার বার মনে হচ্ছে ইমগ্র্যান্ট হওয়া দরকার। পালাতে হবে এদেশ ছেড়ে। না হলে বাঁচতে পারবে না।

দিন কয়েক পরই মাহফুজাকে ফোন করলো।

- কেমন আছো মাহফুজা!
- ভালো। কে বলছেন।
- আজও চিনতে পারোনি।
- ও চিনেছি চিনেছি। রেজা স্যার।
- থ্যাঙ্ক ইউ।
- কেমন আছেন স্যার।
- ভালো নেই। একদম ভালো নেই।
- কেনো স্যার!
- সে এক লম্বা কাহিনী। শুনতে ভালো লাগবে না।
- আপনি একটু অদ্ভুত আছেন স্যার।
- সবাই তাই বলে।
- কার সঙ্গে কথা বলবেন স্যার!

- বস আছে!
- হ্যাঁ দিচ্ছি।

মাহফুজা খুব মিষ্টি মেয়ে। পড়াশোনার ফাকে ফাকে চাকরিও করছে। মনে হচ্ছে বেশিদিন চাকরিটা করবে না।

- কি ঠিক করলেন রেজা সাহেব। ফাইল ট্রান্সফার হবে।
- অবশ্যই।
- ভিসার ব্যাপার আছে।
- আপনি চিন্তা করবেন না। ভিসা ম্যানেজ হয়ে যাবে।
- আর ইউ সিওর!
- সত্যি বলতে কি অলরেডি ভিসা হয়ে আছে।
- তাহলে তো ভালোই হলো। কতদিনের?
- পাঁচ বছর মাল্টিপল।
- গুড। তাহলে ফাইল ট্রান্সফার করে দিচ্ছি।

এসব দোনোমনা করতে যেয়ে রেজাউলের অন্তত দশটি মাস নষ্ট হয়ে গেলো। নিউ দিল্লি ফাইল চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত পক্ষে ফাইল আমেরিকা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া যায়নি। আমেরিকার ভিসার অনিশ্চয়তাটা ভেতরে ছিল। যদিও রেজা জানে ভিসা সে পাবেই, তথাপি ফাইল দিল্লি চলে যাওয়ায় ভেবে ছিল যাক না, দিল্লিতেই না হয় ইন্টারভিউ দেয়া যাবে। পরে হুট করে যখন আমেরিকার ভিসা হয়ে গেলো তখন ফাইল না ট্রান্সফার করার কোনো মানেই হয় না। তাছাড়া রেজাউলের পুরো ফ্যামিলি ডেসপারেট দেশ ছাড়ার জন্য। আমেরিকার ভিসা রেজার শুধু একারই। পুরো ফ্যামিলীর জন্য চেষ্টাও করেনি। রেজার কখনোই আমেরিকা সেট্ল করার ইচ্ছে নেই।

ল' ফার্ম থেকে রাস্তায় বের হয়ে রেজার মনটা বেশ হালকা লাগলো। মনের ওপর চেপে বসা পাথরটা যেনো একটু সরে গেলো। কোথায় যেনে পড়েছে উৎকণ্ঠা এবং আনন্দ দুটো বোধই একই কোষে বিরাজমান। অদ্ভুত ব্যাপার মনে হয়। কখনো হঠাৎ কষ্ট কখনো হঠাৎ আনন্দ। আল্লাহর সৃষ্টি সত্যিই বড়ই রহস্যময়। সত্যি আল্লাহ সর্বশক্তিমান। হাটতে হাটতে রেজা ইয়াম্মি ইয়াম্মি চলে এলো। একাই ঢুকে পড়লো, সাধারণত রেজা ভালো রেস্টুরেন্টে বাচ্চাদের নিয়ে আসে। আজ ওর সব একা করতে ইচ্ছে করছে। একা হাটতে, বেড়াতে, খেতে। একা হওয়ার আনন্দই আলাদা। বিশাল জনগোষ্ঠীর দেশে একা হওয়া বড়ই কষ্টসাধ্য। ইয়াম্মিতে ঢুকে মনে হলো রেজার মোটেই খিদে নেই। কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। সময়টা দুপুর ও বিকালের মাঝামাঝি। প্রায় ফাকা একটা টেবিলে অসম্ভব সুন্দর দেখতে একটি মেয়ে পচা একটি ছেলের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা মারছে। বার বার হেলে পড়ছে ছেলেটির দিকে। বসেছে একদম গা ঘেষে। ছেলেটি দেখতে খারাপ হলেও হাসিটি সুন্দর। দাতগুলো ঝক ঝকে। হয়তো হাসি দেখেই মেয়েটি মজে গেছে। অথবা ছেলেটি অনেক টাকাওয়ালা। টাকাইতো সব। শেষমেশ রেজা একটা মিক্সড ফ্রুটজুস নিল। কিছু একটা না নিলে দেখতে

খারাপ দেখা যায়। স্ট্রতে ঠোঁট রেখে রেজা ভাবলো একদিন ঠিকই হুট করে চাকরিটা ছেড়ে দেবে।

ইয়াম্মি ইয়াম্মি থেকে রেজাউল চলে এলো বাসায়। তিন তলা ফ্ল্যাটের তিন আর রেজা থাকে। মাথার ওপরে ছাদ থাকায় গরমে টেকা দায়। বাচ্চারা খুব কষ্ট পায়। তাই অনেক কষ্টে সৃষ্টে একটি এসি লাগিয়েছে গত বছরই। নিতান্ত দরকার না হলে এসি চালানো হয় না। ঝর্ণা যদি ক্যালকুলেটিভ না হতো তাহলে সংসারটা ঠিকঠাক মতো চলতো না। রেজা প্রকৃতপক্ষে বৈষয়িক নয়, সে হচ্ছে বোহেথিয়ান। নিতান্ত ঠেকায় পড়ে চাকরি করছে। বিয়ে সন্তান এসব না থাকলে দুনিয়ার সবকিছু লাথি মেরে চলতো। এখনও ইচ্ছে করে সবকিছু ভেঙে তছনছ করে ফেলতে। গুমরে মরে ক্ষোভ, জ্বালা নিশ্বাসে বিষ ঝড়ে পড়ে। মনের মধ্যে বড় ঘৃণা এখন। অথচ রেজা সবসময় ছিল কোমল মনের। ভালোবাসাই হচ্ছে যার কাজ। ভালোবেসে মরে যেতে ইচ্ছে করতো যার। সে এখন কঠিন বাস্তবতায় নিষ্পেষিত। মানুষের নোংরা, ক্লেদাক্ত মানসিকতায় ক্ষত বিক্ষত। মানুষ হচ্ছে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষই মানুষকে ভালোবাসে আবার মানুষই মানুষকে ঘৃণা করে। রেজাই দেখেছে মানুষ কত বিচিত্র হতে পারে। 'মুখে মধু অন্তরে বিষ' এ প্রবাদটি চির সত্য। রেজা চাকরি করতে এসে বহুবার এর পরিচয় পেয়েছে। সামনে এসে যে লোকটি মধুর আচরণ করে পেছনেই সে গালি দেয়। চরিত্র হননের যাবতীয় চেষ্টা চালিয়ে যায়। রেজা যে লোককেই বেশি উপকার করেছে সেই বেশি বিরোধিতা করছে। এটাই কি নিয়ম। যে উপকার করে তারচেয়ে খারাপ আর কেউ হতে পারে না। প্রবাদে আছে উপকারীকে বাঘে খায়। এদেশটা এখন তাই।

ভাবতে ভাবতে কখন যে নিজের খাটে ঘুমিয়ে গেছে টেরও পায়নি। স্ত্রী এবং বাচ্চারা সম্ভবত বাইরে গিয়েছিল। ওরা এসে রেজাকে ঘুম থেকে তুললো। অসময়ের ঘুম। মাথাটা ভারভার লাগছে। এ বেলা অফিসও যাওয়া হলো না। আশ্চর্য। ওকে খোঁজার জন্য একটা ফোনও আসেনি। মোবাইল চেক করলো। কোনো কল নেই। বাসায়ও ফোন বাজেনি। বাজলে নিশ্চিত ঘুম ভাঙতো। কপালে যা আছে তা হবেই ভেবে নিশ্চিন্ত বোধ করলো। আলুর চপ ও ফুলকপির পাকোরা বানিয়েছে ঝর্ণা। মজা করে খেলো। এককাপ চা খেলো জিহ্বা পুড়ে। সবশেষে একটা সিগারেট। জীবনটা সর্তিত্য সুন্দর।

৬

কথায় বলে মরার ওপর খারার ঘা। রেজাউল তীব্রভাবে চেষ্টা করছিল সবকিছু মেনে নিয়ে চলতে। এছাড়া আর তো কোনো উপায়ও নেই। ইদুর মারার জন্য যে রকম ফাঁদ পেতে রাখা হয় রেজাও তেমনি ফাঁদে আটকে গেছে। বেড়িয়ে আসতে পারছে না। যখনই মনে হয় ওর জীবনে কোনো স্বাধীনতা নেই তখনই মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সব ছেড়ে ছুড়ে অনিশ্চয়তার জীবনে চলে যেতে ইচ্ছে করে। সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সব মেনে নেয়। একেই বলে মায়ার বাধন।

রেজাউলের চাকরিটা জনসংযোগের। জনসংযোগের কাজকে সব সময়ই থ্যাংকলেস জব বলা হয়। ভালো করলে তার কোনো প্রতিদান নেই কিন্তু খারাপ হলে তার জন্য তিরস্কার আছে। রেজাউলের বস একাধারে শিল্পপতি এবং রাজনীতিবিদ দুইই। রেজাউলের চাকরিটা বসের শিল্প প্রতিষ্ঠানে হলেও শুরু থেকেই জড়িয়ে গেছে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে। কথায় বলে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। বস ইজ অলওয়েজ রাইট। রেজাউলের কখনোই এদেশের রাজনীতি বা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কর্মকান্ড পছন্দ নয়। বস মানুষটা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। কথাকথিত রাজনীতির সাথে তিনিও কখনো একাত্ম হতে পারেননি, তারপরও রাজনীতির কর্দমাক্ত পথে পা দিয়েছেন। ডেকে এনেছেন অশান্তি। একইসঙ্গে রেজাউলের ভবিষ্যতও হয়ে উঠেছে অনিশ্চিত, অন্ধকারাচ্ছন্ন।

মরার ওপর খারার ঘা এজন্যে যে এমনিতে। একটা চরম দু-সময় চলছে। রেজাউলের অশান্তিটা বসের চেয়েও বেশি। বস তার কর্মকান্ডকে যতটা সঠিক মনে করছেন তার দলের হাইকমান্ড তা মনে করছেন না। ফলে একটা গ্যাপ তৈরি হয়েছে। হাইকমান্ড অসন্তুষ্ট হয়ে কিছু শাস্তিমুলক ব্যবস্থা করেছেন। বস এটাকে মেনে নিচ্ছেন না। বসের যোগ্যতা আছে, সট্যামিনা আছে, অহংকার আছে, আর আছে অঢেল টাকা। মাথা নত করতে শেখেননি। বস চেষ্টা করছেন সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে সবকিছু জয় করে নিতে। মানুষের তো আর চাওয়ার কিছু শেষ নেই। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষ চায়। বস চান ক্ষমতা। প্রচন্ড জেদী মানুষটি ক্ষমতা দিয়ে জনগণের সেবক হতে চান। আর তার হাইকমান্ড কিনা তাকে সেই সুযোগটুকু দিতে কৃপনতা করছে। এই হলো এদেশের রাজনীতি। ভালো মানুষদের কেবলই পেছনে টেনে ধরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে চায়।

রেজাউলের অবস্থাও তাই। তবে সমস্যাটা ভিন্ন। বসের দলের এবং তার এলাকার কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক টাউট কিছুতেই রেজাউলকে মেনে নিতে পারে না। গত দশটি বছর ধরে কেবলই ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে চেয়েছে। অনেক ধরনের যন্ত্রণা রেজা সহ্য করে চলেছে। বস মন্ত্রী হওয়ার পরই সমস্যাটা আরো তীব্র হয়েছে। রেজাউল বসের এলাকার লোক নয় বলে সমস্যা আরো বেড়েছে। গাদাগাদা অভিযোগ জমা হচ্ছে রেজাউলের বিরুদ্ধে। বসের কানে তোলা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বস শুনেছেন, ক্ষিপ্তও হচ্ছেন কিন্তু ঐ পর্যন্তই, কোনো এ্যাকশনে যাননি। রেজাউল চায় বস ওকে বাদ দিয়ে দিক। মনে প্রাণে চায়। কিন্তু বস সেটা করেননি। সময়টা হচেছ বস মন্ত্রীত্ব পেয়েছেন কিন্তু আর কিছু পাননি। মন্ত্রণালয় পাননি। তবে রেজাউল আশাবাদী মন্ত্রণালয় তিনি পাবেন, আর যা যা চান তার সবই হয়তো পাবেন। তবে কিছু ভুলের জন্য কিছু ক্ষমতা কেড়েও নেয়া হয়েছে। বস ধৈর্য্যশীর মানুষ। অপেক্ষা করে বসে আছেন।

মরার ওপর খারার ঘা হচ্ছে এমনিতেই নোংরা মানুষদের নোংরামিতে রেজাউলের মন বিষিয়ে আছে। তিক্ত হয়ে আছে, তার ওপর একদিন মন্ত্রী সাহেবের কন্যা রেজাউলকে ডাকলেন। মন্ত্রী সাহেবের কন্যা ইদানীং রাজনীতির কর্দমাক্ত পথে পা বাড়িয়েছেন। মন্ত্রী সাহেবের অভাবনীয় জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে তিনিও যথেষ্ট বাহবা পাচ্ছেন। এটা সব

মানুষই চায় যে তাকে দেখে লোকজন সালাম ঠুকুক, পোগান দিক বা তোষামোদি করুক। এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের লোকজনের কোনো বিবেক নেই, দেশপ্রেম নেই, দয়া মায়া নেই, নেই কৃতজ্ঞতাবোধ। যা আছে তা হচ্ছে, লোভ, নীতিহীনতা, ভ্রষ্টতা আর শঠতা। চরিত্রের তো কোনো বালাই নেই। মন্ত্রী সাহেবের কন্যা সবে এপথে পা বাড়িয়েছেন, লোকজনের চরিত্র বুঝতে সময় লাগবে বৈকি। তিনি সহজ সরল মানুষ বলেই মনে হয়েছে রেজাউলের। রাজনৈতিক লোকদের সত্যকে মিথ্যা বানানো বা নোংরা বুদ্ধির সঙ্গে পরিচয় হয়নি। এই সমস্ত লোকজনই সুযোগ বুঝে মন্ত্রী সাহেবের কন্যাকে গাদা গাদা মিথ্যে অভিযোগ কানে তুলে দিল। হয়তো তিনি এসব বিশ্বাসও করেছেন। মন্ত্রী সাহেব মানুষের চরিত্র বোঝেন। বহু বছর ধরে এদেশের মানুষকে দেখছেন তিনি। রাজনীতির বয়সও এক দশক পার হয়েছে।

তো একদিন ডেকে অভিযোগগুলো বললেন। শুনে রেজাউল আশ্চর্য হলো না। এটাই স্বাভাবিক। তখনই রেজাউল বুঝলো আর সম্ভব নয়। এখানেই এসবের যবনিকাপাত হওয়া ভালো। ঘৃণায় বিষাক্ত হয়ে উঠলো নিজের মন ও শরীর। মন বললো- রেজাউল পালাও, পালাও।

॥৭॥

পৃথিবীতে কেউই পারফেক্ট নয়। রেজাউলও নয়। তবে সে নিজেকে গড়পড়তা আর দশজনের চেয়ে পারফেক্ট মনে করে। রেজাউল সৎ, স্পষ্টবাদী, পরিশ্রমী এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। এগুলো যদি কোনো মানুষের গুন হয়ে থাকে তাহলে একটি ভুল সামজে বাস করছে রেজাউল। এসবের কোনোই দাম নেই। অন্যায় ও নৈতিকতাহীনতার সঙ্গে তাল মিলাতে পারলেই সে ভালো। রেজাউল তার এক দশকের চাকরি জীবনে সব সময়ই চেষ্টা করেছে সততা ও পরিশ্রম দিয়ে যা কিছু অর্জন করতে। কিন্তু রাজনীতির লোকেরা এসবের ধার ধারে না। তারা অন্যায়কে পছন্দ করে। ন্যায় অন্যায় বোধও তাদের অনেক সময় থাকে না। মন্ত্রী সাহেবের কন্যার সবগুলো অভিযোগই ছিল ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক। কিন্তু রেজাউল ছিল অসহায়। কিছু বলার তেমন ছিল না। তারপরও সে মিথ্যে অভিযোগগুলোকে ডিফেন করার চেষ্টা করেছে। অন্যায়কে মেনে নেয়ার মধ্যে কোনো পৌরুষ নেই।

রেজাউল জানে কাজ করতে গেলে কিছু ভুল ত্রুটি হতেই পারে। যারা কাজ করে না তাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও কম। আর রক্ত মাংসের মানুষের ভুলতো হবেই। ভুল থেকেই মানুষ শেখে। বস যে এলাকার প্রতিনিধি সে এলাকার মানুষদের চরিত্র রেজাউল খুব গভীরভাবে দীর্ঘ দশ বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করছে। পশ্চাতপদতা, অশিক্ষা, নদী ভাঙ্গন আর রাজনৈতিক কলহ দীর্ঘদিন এ এলাকাটিকে অন্ধকারে রেখেছে। আজও অন্ধকারেই আছে এবং কোনোদিন আলোর মুখ দেখবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সংশয় আছে। এ এমনই এক জনপদ যেখানে কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। দশজন মানুষ একত্র হলে ধরে নেয়া যায় সেখানে পাঁচটি গ্র□প আছে। সন্দেহ, অবিশ্বাস আর কুটিলতা তাদের রক্তে, অস্থিতে,

মজ্জায় মিশে গেছে। এ রকমই ভয়ংকর এক জনপদের মানুষের সঙ্গে দীর্ঘদিন উঠাবসা রেজাউলের। ওর বন্ধুরা অবাক হয় অন্য এলাকার মানুষ হয়ে এতগুলো বছর এই শ্বাপদের সঙ্গে কিভাবে কাটাতে পারলো। অবাক রেজাউলও হয়।

কথায় বলে ঘরের শত্রুই বিভিষণ। রেজাউলের কর্মক্ষেত্রে যে দু' চারজন বসের এলাকার লোক আছে তাদের চরিত্রও প্রায় একই। সুযোগ পেলেই রেজাউলের বিরুদ্ধে ঘোট পাকায়। রেজাউল সবই বোঝে, সব খবরই ও পায়। রেজাউলের সষ্ঠইন্দ্রিয় খুব প্রখর। ওকে ফাঁকি দেয়া অত সহজ নয়। রেজাউলের সঙ্গেই কাজ করে এরা কিন্তু কখনো আপন মনে করে না। যদিও রেজাউল সব সময় এদের ব্যাপারে চিন্তা করে। ভালো করার চেষ্টা করে, রেজাউলের একটা ড্র ব্যাক আছে অন্যঅয় দেখলে সে রেগে যায়। কন্ট্রোল করা মুস্কিল হয়ে যায়। এটাকেই পুঁজি করে লোকজন। রাজনীতির লোকজন চায় রেজাউল সারাক্ষণ দাত বের করে তাদের সঙ্গে ক্যালাবে। যা করতে বলবে তাই করবে। রেজাউলের সীমাবদ্ধতা হচ্ছে সে তার বসের নির্দেশের বাইরে কখনো কিছু করেনা। বস যদি কাউকে না বলতে বলে তাহলে সে নাই বলে। বসের নির্দেশ পালন করতে যেয়েই তাকে সব ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়েছে। বস কখনোই তেমনভাবে রেজাউলকে প্রটেকশন দেননি। বস উভয় পক্ষকেই খুশী রাখতে চান।

মন্ত্রী সাহেবের এলাকার লোকজন প্রচন্ডভাবে দারিদ্র পীড়িত। অভাব তাদের প্রতি মুখ ব্যদন করে থাকে। অভাব মানুষকে নির্লজ্জ করে দেয়। প্রাকৃতিক কারণেই এলাকাটি হতদরিদ্র রয়ে গেছে। কথায় আছে অভাব যখন দরজা দিয়ে ঢোকে ভালোবাসা তখন জানালা দিয়ে পালায়। এরা ভালোবাসা নিতেও শেখেনি দিতেও। বস অন্যদের চেয়ে বরাবর ব্যতিক্রম। রেজাউলভাবে বস যতটুকু দিয়েছেন ততটুকু কি পেয়েছেন? আবার উল্টোটাও কেউ কেউ ভাবে, যতটুকু পেয়েছেন ততটুকু কি দিয়েছেন? আসলে জীবনে দেয়া নেয়ার হিসাব মেলানো কঠিন। মানুষের অন্তরের ভাষাকে সঠিকভাবে অন্যরা পড়তে পারে না বলেই এত বিপত্তি, অশান্তির সৃষ্টি। যদি পরস্পর পরস্পরকে বুঝতো, ভালোবাসতো তাহলে জীবন হতো অনেক সুন্দর ও মধুময়। কিন্তু জীবন ক্রমেই হয়ে উঠছে বিষময়।

সুযোগটা হঠাৎই এলো। এক উত্তপ্ত সকালে বস 'স্বর্গ থেকে নামলেন'। বাবুই কথাটা শিখিয়েছিল রেজাকে। স্বর্গ থেকে নেমেই নরকের বিষ ঢেলে দিলেন। রেজা এখন মন্ত্রীর এপিএস। সহকারী একান্ত সচিব। এপিএস আরো বেশি লোভনীয় পদ। তবে ছ্যাচরাদের জন্য। কতিপয় দুষ্টচক্র রেজাউল কোনো এপিএস হলো এই দুঃখ এবং ক্ষোভে হা হুতাশ করছে। নানা ফন্দি ফিকির করছে এপিএস থেকে সরানোর জন্য। মন্ত্রীর কন্যা, স্ত্রী এবং খোদ মন্ত্রীর কান ভারী করা হচ্ছে। রেজা এসব বুঝতে পারছে। রেজা নির্বাচনের দু' মাস আগে একবার ভবিষ্যৎবাণী করেছিল নির্বাচন পর্যন্ত চাকির করতে পারবে। এরপর 'দল' যদি ক্ষমাতয় আসে তাহলে বস নিশ্চিত মন্ত্রী হবেন, আর তখনই রেজার চাকরির যবনিকাপাত ঘটবে। চারমাস পর্যন্ত যেটা পার হয়েছে সেটা বোনাস। আর সব বিরোধিতার প্রধান হোতা রেজাউলেরই কলিগ, যাকে রেজাই চাকরি দিয়েছে। 'ওরা' চায় লোকাল লোক, রেজাকে

নয় । তবে মন্ত্রী মহোদয়ের এলাকার হাজারো সাধারণ মানুষ রেজাকে ভালোবাসে, তারা রেজাকে চায়, একদিন না দেখলে খোঁজ খবর নেয় । কিন্তু সাধারণ মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই, তারা একতাবদ্ধ নয় । তাই যদি হতো তাহলে মন্ত্রী সাহেবের পক্ষে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে পারতো । কয়েকজন খারাপ লোক ক্রমাগত মন্ত্রী মহোদয়ের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে । সাধারণ মানুষের মাঝে তিনি এত জনপ্রিয় হওয়া সত্বেও কয়েকজন খারাপ মানুষের কাছে তারা অসহায় ।

বস তার রুমে ঢুকেই রাগতস্বরে রেজাকে বললেন, তুমি এপিএস এর কোনো কাজ করো না । এতোদিন রেজা চুপচাপই ছিল । আজ কথা বললো ।

- আমি স্যার চাকরিই করতে চাই না । আপনি অন্য লোক দেখে নিন ।

বস কথাটা শুনে আরো ক্ষেপলেন ।

- ব্লাডি কোনো কাজ করো না । লোকজনকে ক্ষেপিয়ে তুলেছো ।বসেছে । অপমানটা তীব্রভাবে লাগলো ।

- আমি আর চাকরি করবো না । এই কথা বলে রেজা রুম থেকে বের হয়ে এলো ।

এরপর দুদিন কাটলো । বসের তরফ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া এলো না । তবে রেজা চাকরি করতে চায় না একথাটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো । রেজাও দু' একজন বিশ্বস্ত লোক দিয়ে বসকে বলালো যে সে তার চাকরি করবে না । বস যেনো খুশি মনে রেজাকে বিদায় দেয় ।

চাকরি না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারার সঙ্গে সঙ্গে রেজা নিজেকে হালকা বোধ করলো । গত কয়েক মাসের চেপে বসা পাথরটা অকস্মাৎ সরে গেলো । কিযে একটা দুসঃসময়ই না গেছে ।

এ ঘটনার পরও একমাস পার হয়েছে । রেজা এখনও চাকরি করছে । হালকা মেজাজে । কাজের প্রতি কোনো গাফিলতি নেই । বসও একটু ঠান্ডা আছেন । রেজা জানে এটা সাময়িক । বস এমন একজন মানুষ যিনি রাগী এবং অহংকারী । যে কোনো সময় নিজের রূপ বদলে ফেলতে পারেন । তবে রেজাউলের আর হারানোর কিছু নেই । সে এক পা বাইরে দিয়ে রেখেছে । এখন শুধু সময় ক্ষেপন । রেজাউলের হয়ে দু'একজন বসকেও বলেছেও ।

ক'দিন ধরে মন্ত্রী সাহেব পুরনো মুডে আছেন । হতাশা আছে, দুঃখবোধ আছে তারপরও অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা আছেন, মন্ত্রণালয় আজও পাননি । দলীয় পদ কেড়ে নেয়া হয়েছে । বসে বসে জনগণের টাকা অপচয় করে চলেছেন । আছে শুধু ফ্লাগ, বস ভালো মুডে থাকলে রেজাকে ডেকে কথাবার্তা বলেন । অনেক বিষয় নিয়েই আলাপ হয় ।

- আসলে স্যার এদেশের রাজনীতি খুবই কদর্য । মানুষের মন মানসিকতাও খুব খারাপ ।

- রাজনীতিতে আসাটাই আমার ভুল হয়েছে । তুমি দেখোনা আমার মত একজন কাজের মানুষকে কিভাবে কর্মহীন থাকতে হচ্ছে । ভালো লোকদের জন্য রাজনীতি নয় । আমি এদেশের রাজনীতিতে মিস ফিট ।

- মানুষকে খুশি করা খুব কঠিন স্যার। আমি নিজের দশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যাদের জন্য বেশি করেছি বা আপনি যাদের জন্য বেশি করেছেন তারাই বেশি বিরোধিতা করছে।

- মানুষের নৈতিকতাই ধ্বংস হয়ে গেছে।

- আমি স্যার লোকাল লোক নই বলেও সমস্যা হচ্ছে। আপনি স্যার একজন ভালো লোক দেখে নিন।

- ভালো লোক তো পাই না। তোমার বিরুদ্ধে যারা বলে তাদের বলেছি একজন লোক দিতে। 'তারা' তো কোনো লোক দিতে পারেনি।

- আমি আসলে স্যার এ কাজটা আর করতে চাই না। এর কোনো ফিউচার নেই। উপরন্ত লোকজন অসন্তষ্ট হচ্ছে। আপনাকে, আপনার পরিবারের লোকদের কাছে আমার বিরুদ্ধে বলছে। আপনারা বিব্রত হচ্ছেন। আমি স্যার এসব চাই না। এসবের দরকার কি? আমি না থাকলে যদি সবাই খুশি থাকে। সবদিক রক্ষা পায় তাহলে আমার না থাকাই ভালো।

- আমি যতদিন আছি তুমিও আছ। আমারও ইচ্ছে করে সব ছেড়ে দিয়ে বিদেশ চলে যাই। বিদেশ ঘুরে বেড়াবো তাই ভালো।

- আপনি ছাড়তে পারবেন না স্যার। আপনি এদেশের মানুষকে ভালোবাসেন।

- রাজনীতি ছেড়ে দিলেও মুসকিল। আমাকে ধ্বংস করে ফেলবে।

- ঠিকই স্যার।

- দেখা যাক কি হয়। আল্লাহ ভরসা।

- রেজাউর জানে এসব বসের মনের কথা নয়। ক্ষমতা এমন এক মোহ যা সহজে ছাড়া যায় না। সবার পক্ষে ক্ষমতার মসনদ থেকে বেড়িয়ে আসা সম্ভব নয়।

॥ ৮ ॥

রেজাউল জানে একটি অঞ্চলের প্রতিটি মানুষ খারাপ হয় না। হয়তো বেশিরভাগ মানুষই ভালো। বেশিরভাগ মানুষই নিরীহ। এই ভালো ও নিরীহ মানুষগুলো আবার শক্তিহীন, কারণ তারা সংঘবদ্ধ নয় এই সাধারণ মানুষেরা যদি সংঘবদ্ধ হতে পারতো তাহলে সমাজে অনেক অন্যায় আর অনাচারই বন্ধ হতো। খারাপ মানুষের সংখ্যা অল্প হলেও তারা শক্তিশালী ও সমাজের দন্ডমুন্ডের কর্তা। তারাই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। বসের এলাকায়ও দু' শ্রেণীর মানুষই রয়েছে। খারাপ ও ভালো। রেজাউলের কাছে অদ্ভুত লাগে যারা রাজনীতির ধামাধরা তারা কি সবাই টাউট ও বাটপার? রাজনীতিকরাই সমাজের রাষ্ট্রের নিয়ন্তা- তাহলে তারা খারাপ কেনো হবে? রাজনীতিবিদরা যদি ভালো না হয় তাহলে সমাজ ভালো হবে কিভাবে? ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কিভাবে সুন্দর সমাজ উপহার পাবে রেজাউলের মাথায় ঢোকে না। রেজাউল নিশ্চিত এই ঘুনেধরা সমাজ আর পচা সমাজপতিদের দিয়ে কোনোদিন ভালো কিছু হবে না।

রেজাউল একই পরিবেশে, একই মানুষদের দশ দশটি বছর ধরে দেখছে। দশ বছর তো একেবারে কম সময় নয়। রাজনীতি বা রাজনীতির বাইরে অনেক মানুষ সম্পর্কেই রেজার

স্বচ্ছ ধারণা জন্ম নিয়েছে। রেজাউল নিজের বিশ্লেষণ সম্পর্কে খুবই আস্থাশীল। মানুষ সম্পর্কে সহজেই ধারণা করতে পারে, আর ওর ধারণা খুব কমই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। রেজাউলের বস আবেগপ্রবণ মানুষ। তার নরম মনের আবেগকে উস্কে দিয়ে রাজনীতির টাউটরা অনেক সুবিধা যেমন আদায় করেছে তেমনি অনেক ক্ষতিও করেছে। এই ক্ষতিটা অন্য কেউ দেখতে না পেলেও রেজাউল দেখতে পায়। রেজাউলের তৃতীয় নয়ন অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পায়। রেজাউলের দেখার চোখে তেমন ভুল হয় না। এই যোগ্যতাটাই ওর জন্য সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। ভালো ও মন্দ চিনতে পারাট এবং তা ধরিয়ে দেয়াটা যে মোটেই ভালো কাজ নয় তা অন্তত রেজাউল বুঝতে পারছে। মন্দকে মন্দ বলা যাবে না, ভালোকে ভালো বলা যাবে না। মন্দ মানুষে এই সমাজ ভরে গেছে। এ সমাজ বসবাসের অযোগ্য।

রেজাউলের বস একজন দানশীল মানুষ, তিনি হয়তো তেমন কাউকে প্রতিষ্ঠিত করে দেননি কিন্তু সাময়িক বিপদে বা প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তার এলাকাটা তীব্র অভাবগ্রস্ত এলাকা। লক্ষ লক্ষ হাত সারাক্ষণ প্রসারিত হয়ে থাকে। কতজনকে তিনি সন্তুষ্ট করবেন। দান করে বা দান গ্রহণ করে কোনোটাতেই কোনো ভালো ফললাভ হয় না। বরং দান করে অতৃপ্তি বাড়ানো হয়। যারা সাহায্য পায় তাদের আকাঙ্খাও উত্তোরোত্তর বেড়ে যায়। সাহায্য দেয়া কোনো বাধ্যতামুলক বা ধারাবাহিক ব্যাপারও নয়। এটা দাতার ইচ্ছের ব্যাপার। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সাহায্য প্রাপ্তরা মনে করে এটা বাধ্যতামুলক। যখন সে সাহায্য পেতে ব্যর্থ হয় তখনই সাহায্যদাতাকে শাপ শাপান্ত করে। সত্যি অদ্ভুত মানুষের চরিত্র। দশদিন সাহায্য পেলো, একদিন পেলো না তাতেই দশ দিনের স্মৃতি মুছে গেলো। রেজাউলের বস এসব বোঝেন কিন্তু তারপরও সাহায্য অব্যাহত রাখেন কারণ দানের মধ্যে যে আনন্দ আছে তা থেকে তিনি বঞ্চিত হতে চান না।

তিনি শুধু ব্যক্তিকেই সাহায্য করেন না তিনি প্রতিষ্ঠানকেও সাহায্য করেন। এই সাহায্যের পরিমাণ খুব ছোট নয়। রেজাউলের বস তার সমগ্র এলাকায় অসংখ্য প্রতিষ্ঠানকে প্রায় অব্যাহতভাবে সাহায্য দিয়ে যাচ্ছেন। গড়ে উঠেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ মাদ্রাসা, ক্লাব ইত্যাদি। রেজাউল দেখেছে হাজার হাজার মসজিদ ব্যানার টানিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাহায্য গ্রহণ করেছে। সেখানে নামাজীরা নামাজও পড়ছে। কিন্তু মানুষের চরিত্র বদল হচেছ না কেনো? এর অন্তর্নিহিত কারণটা কি? মন্ত্রী সাহেব খালি হাতে ফেরাতে পারেন না। একইসঙ্গে পেয়ে পেয়ে লোকজন লোভীও কি হয়ে যাচ্ছে না? যারা এ প্রশ্ন তোলেন তারাও কিন্তু ভিক্ষার হাত মাঝে মাঝেই বাড়ান। এ হচ্ছে একই ব্যক্তির দ্বৈত চরিত্র।

সাম্প্রতিক সময়ে বসের সঙ্গে রেজাউলের আলাপ চারিতা বেশি না হলেও অতীতে অনেক অনেক বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হতো। বস এখন সরকারের একজন পূর্ণ মন্ত্রী। অতীতে দশ বছর সংসদ সদস্য ছিলেন। বসের অনেক উত্থান দেখেছে রেজাউল। রেজাউল একজন সফল মানুষের সঙ্গে অনেকগুলো দিন মাস বছর কাটিয়েছে। রাজনীতিতে উত্থান পতন খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। বসের পোর্টফোলিও নেই এটাও একটা স্বাবভাবিক ঘটনা।

রাজনীতিতে সাফল্য ব্যর্থতা দুটোই বসের রয়েছে। ব্যক্তিজীবনে বা কর্মজীবনে বস বরাবর সাফল্যই দেখেছেন। বসকে বলা যায় ভাগ্যের বরপুত্র।

মানুষের চাওয়ার কোনো শেষ নেই। এই জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি...। ব্যাপারটা সেরকমই। বসের ভালোমানুষি ক্ষনিকের। যখন তখন রনমুর্তি ধারণ করতে পারেন। আবার যখন ভালো মুডে থাকেন তখন ফেরেশতাতুল্য। অনেকেই এই ব্যাপারটায় ভুলও করে। ভালো মুডের অনেকে সুযোগ নেয়। কিছু আদায় করে নেয়ার তালে থাকে। এটা ওটা নানা আবদার, তদবির চলে। আবার যখন খারাপ মুড থাকে তখন সব উধাও। লোকজন হতভম্ব হয়। ভাবে এই মানুষ কি সেই মানুষ। গতকাল কত আপনার জন ছিল আজ দেখছি চেনাই যায় না।

তবে রেজার বসের মধ্যে অদ্ভুত একটা সারল্য আছে। রাগী মানুষরা কুটিল হতে পারে না। বরং যারা ঠান্ডা থাকে তাদের মধ্যেই কূটবব্ধি বেশি। এরা শাপের মতো ভয়ঙ্কর। রেজার বস কারো জন্য ক্ষতিকর নন। তবে তার সরলতা বা অতিকথন ক্ষতির কারণ হয়। তিনি রেখে ঢেখে কথা বলতে পারেন না। অতিরিক্ত স্পষ্টভাষীতা অন্যের জন্য কখনো অপমানেরও। গোপনীয়তা ব্যাপারটা তার মধ্যে নেই। দলীয় হাইকমান্ড সম্পর্কেও তিনি সোজা সাপ্টা বলেন। কড়া সমালোচনা করতে ছাড়েন না। বেশিরভাগ লোক সম্পর্কেই বসের ধারণা নেতিবাচক। নিজেকে ছাড়া তিনি অন্য কাউকেই যেমন বিশ্বাস করেন না তেমনি বেশি লোককে বন্ধু ভাবেন বলেও রেজার কখনো মনে হয়নি।

গত দশ বছরে রেজার দেখার অভিজ্ঞতা ব্যাপক ও বিশাল। এত বিচিত্র অভিজ্ঞতা অন্য কোনো পেশায় থাকলে হতো কিনা সন্দেহ। মানুষ সত্যিই এক আজব প্রাণী। রেজার নিজেকেও আজব মনে হয়। মাঝে মাঝে অমানুষও মনে হয়। অমানুষন হলে এতগুলো বছর কিভাবে কাটালো। মানুষ নাকি নাগারে এক জায়গায় দশ বছর কাজ করলে 'গাধা' হয়ে যায়। গাধা না হলেও গাধার খাটুনি খাটতে হচ্ছে রেজাকে উদয় অস্ত।

রেজা এখন বেশ হালকা। একটা ভীষণ চাপ যে সৃষ্টি হযেছিল, সেটা কেটে গেছে। কিসের যেনো অজানা একটা শঙ্কা ছিল, সেই শঙ্কা দূরিভূত হয়েছে। হতে পারে সেটা চাকরি চলে যাওয়া বা অন্যকিছু। কিন্তু এখন আশ্চর্য হয়ে ভাবে সেই শঙ্কাটা ছিল নিতান্তই অমুলক। কারণ রেজাউল তার কাজে কখনো ফাঁকি দেয়নি। সে তার দায়িত্বের অতিরিক্ত করেছে সব সময়। তার ভয় কিসের? চাকরি চলে যাওয়াটা চাকরিরই একটা অংশ। এতে ঘাবড়ানোর কিছুই নেই। রেজা জানে পৃথিবীতে কেউই অপরিহার্য না হলেও একে অপরের প্রতি নির্ভরশীলতা আছে। সমঝোতা ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সমঝোতা গড়ে উঠতে সময়ের প্রয়োজন। রেজার সঙ্গে বসের সমঝোতা গড়ে উঠেছে। সেই সমাঝোতা হচ্ছে কাজের এবং কাজের।

তবে রেজার প্রাপ্যটা কখনোই কাজের পরিমাণের মতো হয়নি। এজন্যে রেজার দুঃখবোধটা তত তীব্র নয়। হয়তো জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট হয়ে গেছে। হয়তো এরচেয়ে ভালো কিছুও হতে পারতো, আবার নাও হতে পারতো। রেজার চাহিদাও তত

তীব্র নয়, আবার লোভীও নয়। অল্পে সন্তুষ্ট বিধায় নিজের ন্যায্য চাওয়াটাও চাওয়া যায়নি, না চাইলে নাকি মাও দুধ দেয় না। রেজা কখনো চাইতে পারে না, নিতান্ত দায়ে না পরলে মুখ খোলে না। তবুও রেজার বসের কাছে রেজা কৃতজ্ঞ, বিভিন্ন কারণে। চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে।

॥ ৯ ॥

সময়গুলো ভালোই কাটছিল। পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও দুঃখ বলে কিছু নেই। তবে দুঃখের দিনগুলো বড় বেশি প্রলম্বিত। দুঃখের রাত সহজে ফুরোতে চায় না। আর সুখ। সেতো সোনার হরিণ। সুখের মুহূর্তগুলো জীবনে খুব ক্ষণস্থায়ী, বড় বেশি স্বল্প।

রেজার বস যে খুব আনপ্রেডিকটটেবল এর প্রমাণ আছে ভুরি ভুরি। সেদিন এর তার একটি নমুনা দেখালেন। রেজা মোটামুটি হালকা মেজাজে ছিল। চাকরি যখন তখন ছেড়ে দেবে, সুতরাং এনিয়ে তেমন উৎকণ্ঠা নেই। কাউকে কিছু বলছেও না আর। রেজা দুটো কারণে সময় নিচ্ছিল- একটি হলো একজন এপিএস হওয়ার যোগ্য লোক খোঁজা এবং অন্যটি নিজেকে কিছুটা গুছিয়ে নেয়া। কেননা গত দশ বছর বাইরের জগতের প্রতি বেশি যোগাযোগ ছিল না, সুযোগও হয়নি। পৃথিবীটা বড় বেশি কঠিন জায়গা। কেউই প্রায় তার কাজ নিয়ে সুখি নয়। রেজার প্রতি বসের যথেষ্ট সিমপ্যাথি আছে, না হলে এতগুলো বছর এরকম ঝুকিপূর্ণ কাজটি করতে পারতো না। খুব সাধারণ একজন মানুষ রেজা। এই পৃথিবী থেকে রেজা দুঃখই শুধু পায়নি এর বাইরেও অনেক কিছু পেয়েছে। এই পৃথিবীতে মানুষ হয়ে যে জন্মেছে এজন্যে সৃষ্টি কর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতার কোনো শেষ হে। মানুষ হয়ে জন্মানো খুবই আনন্দের। প্রতিটা মানুষের শিশুকালটাই সবচেয়ে ভালো। বুদ্ধিমান এবং সেনসেটিভ মানুষদের জন্য পৃথিবীটা কষ্টের জায়গা। রেজা ছাত্রজীবনে প্রচুর পড়াশোনা করেছে, সুযোগ পেলে এখনও পড়ে। প্রচুর পড়াশোনার ক্ষতিকর দিকহলো তাদের মানটা হয়ে পড়ে আবেগপ্রবন। রেজাও আবেগপ্রবণ মানুষ। তার হৃদয়ের অন্তর্নিহিত কষ্ট এবং জ্বালা কাউকে বোঝাতে পারে না। মা, ভাই বোন বা স্ত্রীও বুঝতে পারবে না অব্যক্ত কষ্টের কথা। এজন্য জন্মটা যেমন আনন্দের তেমনি বেদনারও। বেদনার নীল যন্ত্রণা শুধুই গুমরে মরে। জীবনে রেজার প্রাপ্তিও কম নয়। নিজের জন্মকে এজন্য ব্যর্থও মনে হয় না। তবে প্রতিটা অর্জন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নয়। প্রতিটি অর্জন কষ্টসাধ্য। নিজের মেধা, শ্রম ইত্যাদি দিয়েই যা কিছু প্রাপ্তি ঘটেছে। রেজার শৈশব ও কৈশোর কাল ছিল খুব অনুজ্জল ও ঘুমন্ত।

সেদিন একটি পত্রিকার প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বস বক্তৃতা করছিলেন। রেজা সামনের আসনে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে বক্তৃতা শুনছিল। ডায়াসে তার বক্তৃতা যথারীতি রেকর্ড হচ্ছিল, ক্যামেরায় ছবিও তোলা হচ্ছিল। রেজা বসের সব প্রোগ্রামে সাথে থাকে। এ পর্যন্ত অর্থাৎ গত দশ এগারো বছরে কমপক্ষে এক হাজারবার বসের এলাকা সফর করেছে। বসের জনসংযোগ খুবই ভালো। যে যখন ডেকেছে ছুটে গেছেন। এজন্য তিনি প্রতিবার বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। দল পরিবর্তনের রাজনীতিও করেন না।

বস খুব ভালো বক্তৃতা করেন। শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। কণ্ঠস্বর খুবই ভালো। বসের সঙ্গে রেজাউলের প্রথম কথা হয়েছিল ফোনে। এর আগে বসকে রেজা দেখেওনি। সেদিন কণ্ঠস্বর শুনে মুগ্ধ হযেছিল। কণ্ঠস্বর শুনে বয়স মনে হয়েছিল বেশ কম। কিন্তু যেদিন প্রথম দেখল সেদিন বুঝল ওর ধারণা একদম ঠিক নয়। কণ্ঠস্বর শুনে বয়স আন্দাজ করা কঠিন। এরকম ভুল বহুবার হয়েছে রেজার। বসের উপস্থাপনা খুব ভালো কিন্তু বক্তৃতায় নতুনত্ব তেমন থাকে না। বসের হাজার হাজার বক্তৃতা রেকর্ড করা হয়েছে, সেগুলো সব নতুন করে শুনলে সবগুলোকেই প্রায় একই বক্তৃতা মনে হবে। বক্তৃতার এক পর্যায়ে বস স্থানীয় সাংবাদিকদের প্রসঙ্গটা উঠালেন। তিনি বললেন, আজকের এই পত্রিকা প্রকাশনা অনুষ্ঠানে কোনো সাংবাদিককে দেখতে পাচ্ছি না। আমি বুঝতে পারি না আমার প্রোগ্রামে সাংবাদিকরা কেনো আসে না। আমি শুনেছি আমার কারণে নয়, আমার প্রতি সাংবাদিকরা অখুশি নয়। আমার এপিএসের ওপর সাংবাদিকরা খুশি নয় তাই তারা আমার প্রোগ্রামে আসে না। কি কারণে তারা আমার এপিএস-এর ওপর খুশি নয় তা তারা পরিষ্কার করে বললে ভালো হয়। আমি অনেকবার বলেছি তারা যদি রেজার চেয়ে একজন ভালো লোক দিতে পারে যে আমার কাজগুলো বুঝবে, যার জনসংযোগ ভালো এবং আমার এলাকার কাজ করতে পারবে তাহলে আমি ওকে সরিয়ে দেবো। কেউ তো রেজার চেয়ে বেটার একনজকে দিতে পারেনি।

বসের জেলার প্রেসক্লাব ভিত্তিক সাংবাদিক, জাতীয় সংবাদপত্রের সংবাদ ও সংবাদপত্র নিয়ে অনেক অনেক ঘটনা ঘটেছে বিগত বছরগুলোতে। রেজা মুলত নিজেকে সাংবাদিক ও লেখক ভাবতেই বেশি ভালোবাসে, পরিচয় দিতেও। এর বাইরে যে কোনো চাকরিকে রেজা ঘৃণা করে, এমনকি যে চাকরিটা করছে সেটাকেও। রেজার দুর্ভাগ্য যে নিজরে অগোচরেই একটি রাজনীতি ভিত্তিক চাকুরিতে জড়িয়ে পড়েছে। রেজার চাকরির শুরুটা ছিল জনসংযোগ কর্মকর্তার। সেটা অনেক ভাো ছিল। চাকরি জীবনের প্রায় শুরুতেই বস নিজেও রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং রেজাও যুক্ত হয়ে পড়ে। সেই দুর্ভাগ্যের গ্লানি থেকে এখনও মুক্তি পাওয়া যায়নি।

সাংবাদিকদের প্রতি বরাবর রেজার একটা দুর্বলতা রয়েছে। জনসংযোগ কর্মী এবং নিজে সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে এদেশের সাংবাদিক সমাজের সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। জাতীয় প্রেসক্লাবের একজন সদস্য ছাড়াও রেজার রয়ছে ওয়ার্ল্ড প্রেস কার্ড যা কিনা আমেরিকার ওয়াশিংটন ভিসি থেকে ইস্যু হয়েছে। এছাড়াও রেজা ওয়ার্ল্ড আইডি কার্ড, ওয়ার্ল্ড সিটিজেন কার্ড এবং ওয়ার্ল্ড পাসপোর্টের অধিকারী। এগুলোও আমেরিকা থেকে এস্যু হয়েছে।

ঢাকার সাংবাদিক আর মফস্বলের সাংবাদিকদের মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। রেজার সঙ্গে ঢাকার বড় বড় পত্রিকার সাংবাদিকদের সঙ্গেই রয়েছে ঘনিষ্ঠতা। একজন দক্ষ জনসংযোগকর্মী হিসেবে রেজা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। যদিও জনসংযোগের চাকরিটা সম্পূর্ণই একটি থ্যাংকলেস জব। বসের মিডিয়া কভারেজ সবসময় ছিল ভালো। রেজা এ

ব্যাপারে খুবই দক্ষতার পরিচয় দিয়ে এসেছে বরাবর। অনেক কভারেজই হয়েছে রেজার সঙ্গে সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে। রেজার জনসংযোগের কারণে বসের পরিচিতি বহুগুণ বেড়েছে। এটাই একজন জনসংযোগ কর্মীর কাজ হওয়া উচিত বলে রেজা মনে করে। শুধু ব্যক্তি নয় প্রতিষ্ঠান এবং পণ্যের প্রচারের জন্যও জনসংযোগ কর্মীর ভূমিকা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিডিয়ার সেতুবন্ধন রচনা করাও জনসংযোগ কর্মীর দায়িত্ব। একজন জনসংযোগ কর্মীর বহুগুণের অধিকারী হতে হয়। রেজা বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতির একজন কর্মকর্তাও।

ঢাকার সাংবাদিকদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যারা ক্ষমাতবান এবং আর্থিকভাবে স্বচ্ছল। সে তুলনায় মফস্বলের সাংবাদিকদের অবস্থা খুব খারাপ। দু' চারজন ছাড়া অনেকেই পত্রিকা থেকে বেতন পাননা। একটা পরিচয় পত্রই তাদের প্রধান হাতিয়ার। লেখাপড়াও অনেকেই বেশি কিছু করেনি। কোনো এক অদৃশ্য কারণে বসের এলাকার কয়েকজন সাংবাদিকের মন জয় করতে রেজা ব্যর্থ হয়েছে। রেজার শিক্ষা কালচার ইত্যাদির সঙ্গে এদের বিরাট তফাৎ থাকা সত্বেও সব সময় এদের মন যুগিয়ে চলার চেষ্টা করেছে, প্রয়োজনে সহযোগিতা করেছে তারপরও কেনো যেনো রেজাকে কেউ কেউ সহ্য করতে পারেনি। বসের সমারোচনা করে কোনো রিপোর্ট প্রকাশিতহলেই দায়ী করা হয় রেজাকে। বসের এলাকার দু' একজন সাংবাদিক আছেন যারা ভালো, লিখতে পারেন, কাউকে ব্লাকমেল করেন না, এমনকি রেজার কাছ থেকে কখনো টাকা পয়সাও নেয়নি। মফস্বল সাংবাদিকদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এরা দলীয় লেজুবৃত্তি করেন। সংবাদ পরিবেশন নিরপেক্ষভাবে করেন না। অনেক সময় মিথ্যে বা অতিরঞ্জিত সংবাদও পরিবেশন করেন। রেজার বস মিথ্যে সংবাদ পরিবেশন করলে ক্ষেপে যান। এর দায় দায়িত্ব এসে চেপে বসে রেজার ওপর। বস একথা বুঝতে চান না যে রেজার কথা মত পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশিত হবে না। এদেশে টাকা দিয়ে সংবাদ বানানো যায় এটা ঠিক তবে রেজা বরাবর এই কাজটিকে অপছন্দ করে এসেছে। সাংবাদিকের দায়িত্ব হচ্ছে সঠিক সংবাদ পরিবেশন করা। একপেশে বা পক্ষপাতমুলক সংবাদ না পবিবেশন করা।

বসের এলাকার কতিপয় সাংবাদিকের রেজার প্রতি অসন্তষ্টির কয়েকটি কারণ রেজা আবিষ্কার করেছে সেগুলো হলো- কেউ কেউ মনে করে সাংবাদিকদের জন্য বড় অংকের বাজেট থাকে যা রেজার কারণে পাওয়া যায় না, দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে রেজার কারণেই সাংবদিকদের সঙ্গে তার বসের দূরত্ব তৈরি হয়েছে অর্থাৎ রেজা দূরত্ব তৈরি করে রেখেছে। তিন নম্বর কারণ হচ্ছে মনস্তাত্তিক। যে কোন ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স থেকে রেজাকে তারা সহ্য করতে পারে না। একথা ঠিক যে রেজার বস তার এলাকার সাংবাদিকদের ওপর মেটেই নির্ভরশীল নয়। ঢাকার সাংবাদিকদের সঙ্গে বিশেষত কিছু সম্পাদকদের সঙ্গেই তার রয়েছে গভীর সম্পর্ক। তারপরও রেজা বা তার বস সবার সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চান। ঢাকা থেকে কোন সাংবাদিক এলাকায় নিউজের জন্য পাঠানোকেও মফস্বলের সাংবাদিকরা সহ্য করতে পারে না। এরা এতটাই ভয়ংকর যে এদের সঙ্গে পেরে উঠাই মুস্কিল। মফস্বলের

সাংবাদিকের নাম শুনলে এখন আৎকে উঠতে হয়। এরা পারে না এমন কোনো কাজ নেই। এদের খুশি করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে মফস্বলে অনেক সৎ ও কমিটেড সাংবাদিকও রয়েছেন। মোটকথা বসের এলাকার সাংবাদিকদের রোষানলে এমনভাবেই রেজা পড়েছে যে ওর জীবন বিষময় হয়ে উঠেছে। হাজারো চেষ্টা করেও রেজার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো খন্ডন করতে পারেনি। সকল অভিযোগই যে ভিত্তিহীন তা বসকেও বোঝাতে সক্ষম হয়নি রেজা। কারণ রেজা নিশ্চিতভাবে জানে ক্ষোভটা মোটেই রেজার ওপর নয়। রেজাকে স্রেফ গিনিপিগ বানিয়ে সব দোষ রেজার ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। তবে রেজা এসব অভিযোগকে আজকাল আর তোয়াক্কা করে না। সত্য একদিন প্রতিষ্ঠিত হবেই। অহেতুক মিথ্যে অভিযোগ করে বড় কিছু অর্জন করা যায় না। রেজার এই দীর্ঘ চাকরি জীবনে সাংবাদপত্র সাংবাদিক এবং সংবাদ নিয়ে ঘটনা অনেক ঘটেছে। কোনটা আনন্দের কোনটা দুঃখের। সবই ছিল ওর চাকরিরই অংশ, অন্যের আনন্দ এবং সাফল্যের জন্যই রেজা বৃথা শ্রম দিয়ে গেল। নিজের অর্জন হলো না কিছুই।

॥ ১০ ॥

জীবন এভাবেই এগিয়ে চলছে। জীবনে পরিবর্তন খুব দ্রুত ঘটে না। অনড় পাথরের মতো জীবন কখনো কখনো থেমে থাকে। রেজাউল দ্রুত কোনো পরিবর্তন আশা করতে পারে না। পেশার পরিবর্তন যদিওবা ঘটানো সম্ভব হয় নতুন করে শুরু করা কম কঠিন কাজ নয়। রেজা- ভাবে নিজ থেকে চাকরি ছাড়া বড় কঠিন কাজ। বসের কাছে উপস্থাপন করা অত সহজ নয় ওর কাছে, বসও যে সহজে ছেড়ে দেবে তাও মনে হয় না। রেজার স্ত্রী ঝর্না মনে করে এটা কোনো ব্যাপারই নয়। ছেড়ে চলে আসলে হয়। ল্যাঠা চুকে গেলো। অতএব একটা প্রচন্ড সীদ্ধান্তহীনতায় দিন কাটছে। গত ক'দিনের হালকা ভাবটা পুনরায় চলে গেছে। এখন নতুন করে দুশ্চিন্তা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে বুকে। বসের আশার দিনও ফুরোচ্ছে না। বুকে স্বপ্ন নিয়ে বসে আছেন এই বুঝি তার ভাগ্যের শিকে ছিড়ল। তিনি অঢেল বিত্তশালী মানুষ বলে এখনও টিকে আছেন। অন্য কেউ হলে ভেঙে খান খান হয়ে যেতো। তবে বসের পলিসিতে অনেক ত্রুটি আছে। তিনি সহজে কারো বুদ্ধি নিতে চান না। আবার হঠাৎ করে এমন লোকের বুদ্ধি গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নেন যা তার জন্য ভালো ফল বয়ে আনে না। তিনি নিজে যা ভালো মনে করেন তাই চাপিয়ে দেন। তাকে সৎ পরামর্শ দেয়ার লোকের সংখ্যাও খুব কম। তার প্রবল ব্যক্তিত্ব বা উষ্ণার মুখে অন্যরা তেমন উৎরে উঠতে পারে না। তাকে সৎ বুদ্ধি দেয়ার মত শক্তিশালী লোক তেমন নেই। তিনি শক্তিশালী লোকের সঙ্গে মেশেনও কম। যারা খুব লেস ইমপর্টেন্ট তাদের গুরুত্ব দেন বেশি। একজন পিওন গোছের লোককেও তিনি অনেক সময় দেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলো নিজের গুরুত্ব নষ্ট করে। সব কিছু মিলিয়ে একটা খারাপ সময় যাচ্ছে। প্রতিটা মানুষের উচিত নিজেকে আয়নায় দেখা। আত্মসমালোচনাও দোষের কিছু নয়। আমিই সর্বেসর্বা বা আমিই সব বুঝি আমার কথায়ই সব হবে এমনটা ভাবা ঠিক নয়। সব কর্মেরই একটা ফল আছে।

রেজাউল স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে সে আর চাকরি করতে পারবে না। আরো আগেই তার ছেড়ে দেয়া উচিত ছিল কিন্তু বিভিন্ন কারণে সে পারেনি। প্রথম কারণ হুট করে চলে এলে বস যদি ক্ষিপ্ত হন। কোনো অ্যাকশন নেন এই ভয়টাই বেশি ছিল। দ্বিতীয়ত রেজাউল অন্য কোথাও কিছু জব অফার তৈরি করতে পারেনি, সে সময়ও পায়নি। তবে ঝর্নার কথায় সাহস পায় রেজাউল। ঝর্না কাউকে তেমন পরোয়া করে না। ওসব বস ফস ঝর্নার কাছে নস্যি। নিজের দুর্বলতার কথা ঝর্নার কাছে বলা যায় না তাতে ঝর্না আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। দশ বারো বছর একত্রে কাজ করলেও সব সময় মানুষকে চেনা যায় না। রাগের মাথায় অনেক কিছু করে বসতে পারে। এই আশঙ্কাটাই রেজাউলকে দুবর্ল করে দেয়। কখনো কখনো ভাবে কোথাও গিয়ে গা ঢাকা দেবে। এমনকি ইউরোপ আমেরিকা যাওয়ার চিন্তাও মাথায় আসে। আবার এও ভাবে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ক' মাস পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে। সেভিংস তেমন কিছু নেই। লোকে মনে করে রেজাউল অনেক টাকা হাতিয়েছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা তা নয়। বস মানুষটা ভালো কেউ হাত পাতলে ফিরিয়ে দেন না সহসা। সেটা ভিক্ষার সমতুল্যই। বস নিজে থেকে রেজাউলকে কোনো দিন কোনো সহযোগিতার কথা বলেননি। বেতন যা পেতো তা অবিশ্বাস্য রকম কম। লোককে বলা যায় না। বসের সম্মানের দিকে লক্ষ্য রেখে রেজাউল কখনো তার প্রকৃত বেতনের কথা কাউকে বলেনি। বরং বাড়িয়ে বলেছে। এতে সবার ধারণা হয়েছে রেজাউল খুব মজাতে আছে।

এরকম পরিস্থিতিতে রেজাউল আবার ক'দিনের ছুটি নিয়ে সপরিবারে ভারত বেড়াতে গেলো। ভেবেছিল মানটা ভালো হবে। যে ক'দিন ছিল খারাপ কাটেনি। কিন্তু দেশে ফিরেই পুরনো রোগে আক্রান্ত হলো। কিছুতেই কাজে মন বসানো যাচ্ছে না। কাউকেই তেমন সহ্য হয় না। মনে হয় চারদিকে মানুষ শত্রুতা করার জন্য ওৎপেতে আছে। বাস্তবেও হচ্ছে তাই। অনেকের মুখেই শোনা যায় রেজাকে নিয়ে খুব কথা হচ্ছে।, শুনতে শুনতে অসহ্য হয়ে গেছে। এত বছর কাজ করে এই হচ্ছে ফল! রেজাউল শেষমেষ মরিয়া হয়ে বসের মুখোমুখি হলো।

একথা সে কথার পরে রেজাউল বলল,

- একজন ভালো লোক পাওয়া গেছে স্যার।

- কে!

- আপনার এলাকারই। লোকজনও এলাকার লোক চায়। বেশ চালাক চতুর। আমার মনে হয় পারবে।

- তুমি কি করবে।

- দেখি একটা কিছু ব্যবস্থা করে নিতে পারব।

রেজাউল চাচ্ছে যে কোনো উপায়ে ছাড়া পেতে। সে আদৌ জানে না কতদিনে তার আর একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। সে প্রায় মরিয়া, তার স্ত্রী সন্তানের কথা ভাবারও সময় নেই। যা হবার হবে। ঘনিষ্ঠজনদের কেউ কেউ বলছেও ছেড়ে দিতে। অনেককে চাকরির কথাও বলে রেখেছে।

- দেখো ঢাকায় তোমার কোনো বাড়ি নেই। তোমার অনেক খরচ ছেলেমেয়ে নিয়ে।

এ কথায় রেজাউল নিশ্চুপ থাকালই শ্রেয় মনে করে। এসব কথায় খুব আস্থাও রাখা যায় না। বস তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে লাথি মারতেও দ্বিধা করে না, এ রকম ভুরি ভুরি উদাহরণ রেজাউলের নিজের চোখে দেখা। তাই রেজাউল ঠিক করলো কোনো মিষ্টি কথায় সে ভুলবে না। সবচেয়ে বড় কথা রেজাউলের অনেক বদনাম হয়ে গেছে। এর বোঝা বাড়ানোর আর ইচ্ছে নেই। যদিও এপিএসে'র পোস্টটা বেশ লোভনীয়, ধান্দা ফিকির করতে পারলে আখেরে ফলও ভালো। এ পর্যন্ত অধিকাংশ মন্ত্রীর এপিএসই ভাগ্য বানিয়ে নিয়েছে। একমাত্র রেজাউলই স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দিতে চাচ্ছে। যে কিনা একজন প্রভাবশালীও ধনশালী ব্যক্তির সঙ্গে দীর্ঘদিন থেকেও কিছুই করতে পারেনি। লোকে একে বোকামী ছাড়া আর কিছু মনে করে না।

- লোকটা কে?

নাম বলায় বস চিনলেন। রেজাউল বেশ বিনয় করলো যাতে ওকে ছেড়ে দেয়। এতেই কাজ হলো। বস নরম হলেন। রেজাউল কিছুতেই বসকে খেপাতে চাইছিল না। সে সফল হলো।

রেজাউল হাফ ছেড়ে বাঁচল। যেনো জাহান্নাম থেকে ফেরত এলো। যে নরকে দেবে যাচ্ছিল তা থেকে যেনো রেহাই পেলো।

নতুন এপিএস এলো। তার অ্যাপয়েনমেন্ট লেটারে বস নির্দ্বিধায় সই করলেন। রেজাউল সেই মুহূর্তে আর কেউ নয় হয়ে গেলো।

এরপর প্রায় একমাস রেজাউল নতুন লোককে কাজ বোঝালো। নিজে থাকলো কর্মহীন। এই এক মাসে বস কোনো সম্মানীও দিল না। তারপরও রেজাউলের নিজেকে বেশ হালকা মনে হলো। প্রজাপতির মতো। রেজাউলের বিশ্বাস একদিন খুব ভালো একটা চাকরি তার হবেই।

॥ ১১ ॥

ভেবেছিল সাংবাদিকতা ও লেখালেখি করে কেরিয়ার গড়ে তুলবে। সাংবাদিকতায় ভালোভাবেই লেগে পড়েছিল। পড়শোনা শেষ করেই বিয়ে করে ফেলে রেজাউল। বিয়ের আগে কয়েক বছর প্রেম পর্বও চালু ছিল। একটি দামী পত্রিকায় কাজ করার সুবাদে বেশ নামও হতে চলছিল। সাংবাদিকতার পাশাপাশি গদ্য লেখারও চেষ্টা চলছিল। কিছু কিছু লেখা ছাপাও হচ্ছিল। আসলে হয়েছে কি মফস্বল থেকে ঢাকা শহরে পাড়ি দিয়ে খুব একটা সুবিধে করতে পারছিল না রেজাউল। এমনিতে সে যথেষ্ট লাজুক প্রকৃতির। ধরা ধরির ব্যাপারটাও রপ্তও হয়নি। ফলে সব সময় পিছিয়ে থেকেছে। ওকে টপকে অন্যেরা তর তর করে উঠে গেছে। সাংবাদিকতায় ফুলটাইম হতে দেরি হচ্ছিল। চাকরিটা লেগেও লাগছিল না। রেজাউল সেরকম চেষ্টাটাই করে উঠতে পারেনি। দ্বিধাই ওকে পিছিয়ে রাখল। অথচ একটা

স্থিতির চাকরি অত্যবশ্যক হয়ে উঠছিল। বিয়ের বছর না ঘুরতেই একটি পুত্র সন্তানের জনক হলো রেজাউল। রেজাউলের না হলেও ঝর্না ততোদিনে একটি চাকরি বাগিয়ে ফেলেছে। সে যথেষ্ট বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন মেয়ে। সে বুঝে গেছে রেজাউলের ওপর ভরসা করে থাকলে কপালে দুঃখ আছে। রেজাকে বিয়ে করেই তো সে বড় ধরনের ঝুকি নিয়েছে। আর কত।

সাংবাদিকতার চাকরিটা যখন পকাপোক্ত হচ্ছিলই না তখন ঝর্না অন্য পথ ধরতে চাপ দিতে লাগল। অন্য কোথাও তেমন যোগাযোগও ছিল না। এক পর্যায়ে পত্রিকা নির্বাহী সম্পাদক রেজাকে ডেকে বললেন, দেখো, তোমাকে চাকরি দেবো কিন্তু একটু দেরি হবে।

- কিন্তু আমার তো...

- বুঝতে পারছি। একটা কাজ করো, তুমি কি প্রাইভেট চাকরি করতে ইন্টারেস্টেড?

- কোথায়?

- আমার পরিচিত বড় কোম্পানি। পিআর ম্যান দরকার। তোমার কাজের সাথে রিলেটেড। যেয়েই দেখো। ভালো লাগলে করলে। আর লেখালেখিও চালিয়ে গেলে। কোনো অসুবিধা নেই। ওখানকার এমডি সাহেবের সঙ্গে তোমার অ্যাপয়েনমেন্ট করিয়ে দিচ্ছি।

সাংবাদিক বড় ভাইয়ের কথা মোতাবেক একদিন ফোন করল রেজাউল বড় কোম্পানির এমডি সাহেবকে। তিনি দু'দিন পর বিকেল পাঁচটার সময় দিলেন।

রেজাউল যথাসময়ে একটি বায়োডাটা নিয়ে চলে গেলো সেই অফিসে। সিড়ি দিয়ে ওঠার সময় রেজাউলের মনে হয়েছিল এ অফিসে ওর চাকরিটা হবে না। এরকম মনে হওয়ার কারণ হচ্ছে সিড়িটা বড় বেশি ঝকঝকে ছিল। যে কোনো অফিসের ঝকঝকে সিড়ি দেখলেই রেজাউলের নেগেটিভ ধারণা জন্মায়, সে অফিসের সিড়ি যত বেশি ঝকঝকে সে অফিসের ম্যানেজমেন্ট তত খারাপ। অবশ্য এর ব্যতিক্রম থাকলেও থাকতে পারে।

সাক্ষাৎকার পর্বটি যথেষ্ট সৌহার্দপূর্ণ ছিল। এবং এর দু' আড়াইমাসের মাথায় সেই বড় কোম্পানিতে রেজাউল পিআর ও হিসাবে জয়েন করেছিল। প্রথম ছয় মাসের জন্য সাড়ে তিন হাজার টাকা বেতন ধরা হয়েছিল, যা দেখে প্রথমেই প্রচন্ড হতাশ হয়েছিল রেজাউল। আবার প্রত্যাখ্যানও করেনি। লেগে পড়েছিল।

আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কি কোনো ক্ষেত্রেই রেজাউল খুব বেশি সাকসেসফুল হতে পারেনি। একটু এগোয় একটু পিছোয় এরকম আর কি। কেনো যে কারো মন পুরোপুরি জয় করতে পারে না। দেখতে শুনতে রেজাউল খারাপ না, কথাবার্তাও ভদ্রগোছের। তবে রেজাউলেরই মনে হয় অন্যদের মতো চালাক ও ধুর্ত হতে পারছে না বলেই পিছিয়ে পড়ছে। সাংবাদিকতা করতে যেটুকু মেধা দরকার তার সবটুকু থাকা সত্বেও রেজাউল তেমন সফল সাংবাদিক হতে পারেনি। সংসার ও বেঁচে থাকার চাপ ছিল সবসময়ই। তার উপর রেজাউলের ছিল না কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ ঢাকা শহরে কোনো গডফাদার। এ শহরে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্য যে বংশ পরিচয় দরকার তার কিছুই ছিল না রেজার। যেটুকু হয়েছে তা নিজের যোগ্যতার জন্যই। একজন সম্পাদকের অধীনেই প্রায় আঠারো বছর কাজ

করেছে। তার বদৌলতে যথেষ্ট নামও হয়েছে রেজার। তার কাঝেও চিরদিন কৃতজ্ঞ। রেজা কখনো তাকে ছেড়েও যায়নি। সাংবাদিকরা সাধারণত ঘন ঘন পত্রিকা বদল করে। রেজা সেটা করেনি। এখনও একই জায়গায় লেগে আছে। যে কোনো সময় আবার বাদও পড়ে যেতে পারে। এটাই জীবন। কোথাও বোধহয় স্থায়ী বলে কিছু নেই। রেজা বোঝে ওকে আরো চৌকষ হওয়া দরকার কিন্তু পারে না। অনেক ঠকেও শেখাটা যেনো হয়ে উঠছে না। পিআর এর চাকরিতে ছ' মাস যেতে যেতে না যেতেই এমডি সাহবের নজরে পড়তে সক্ষম হলো রেজাউল। এমডি সাহেব অর্থাৎ বস প্রথমবার রাজনীতির খাতায় নাম লেখালেন এবং জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেন। এ পর্যন্ত বস চার চারবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। রেজাউল বসের পাশে পাশেই থেকেছে এ পর্যন্ত। প্রথম পঁচটি বছর পার করার পর চাকরির প্রতি অনীহা এসে গেলো। বসের অফিসের দু'একজন বড় অফিসারের আচরণ এমনই জঘন্য ছিল যে রেজাউল টিকতে পারছিল না। তার ওপর রাজনীতির লোকদের নোংরামি তো ছিলই। এক সময় সেন্টিমেন্টাল হয়ে রেজাউল চাকরিতে ইস্তফা দিল। অন্য জায়গায় জয়েন করেও শেষ পর্যন্ত বসের কাছেই ফিরে আসতে হয়েছে।

বসের অফিসে সে সময় একজন ভদ্রলোক আসতেন প্রায়ই। তিনি একটি প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ার। বসের একটি নতুন কোম্পানির কনস্ট্রাকশনের ব্যাপারটা দেখতেন। ওখান থেকেই পরিচয়। রেজাউলের তখন চাকরিতে দুরবস্থা চলছে। সেই ভদ্রলোক অফার দিলেন তাদের কোম্পানিতে জয়েন করতে। রেজাউল রাজী হয়ে গেলো। কিন্তু সেখানে ঢুকেও কিছু অসংগতি নজরে এলো। আর বসের পিআর করার জন্য যাকে রেজাউল দিয়েছিল সেও পেশায় একজন সাংবাদিক হলেও বয়স বেশি হওয়ার কারণে পেরে উঠছিল না। বসও চাচ্ছিল আমি তাকে কাজ বুঝিয়ে দেয়ার জন্য অন্তত দু' মাস থেকে যাই। রেজার ধারণা হয়েছিল এভাবে না থাকলে ওর বেনিফিটের পাওনা টাকা আটকে দিতে পারে। এই ভয়ে নতুন অফিস থেকে দু' মাসের সময়ও নিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রেজাউল বসের সাথেই থেকে গেল। তবে সে বসের কোম্পানির চাকরিটা হারালো। রেজাউল বসের ব্যক্তিগত স্টাফ হয়ে গেলো। বেতন পেতো তার ব্যক্তিগত টাকা থেকে। বস রাজনীতির শুরু থেকেই একটি আলাদা রাজনৈতিক কার্যালয় খুলেছিল। এলাকার লোকজন সেই অফিসেই আসতো সাক্ষাৎ পেতে।

॥ ১২ ॥

প্রথম দিনের সাক্ষাৎকার পর্বটির কথা রেজাউল আজও মনে করতে পারে। সময়মতই পৌঁছে ছিল অফিসে। ঝকঝকে সিড়ি দেখে নিশ্চিত হয়েছিল কিছুই হবে না। ঠিক পাঁচটায় বসের রুমে ডাক পরলো। রেজাউল মোটামুটি সেজেগুজে গিয়েছিল। এটাই তখন তার কাজ। একটা চাকরির বড় প্রয়োজন। ছিমছাম একটি কক্ষ। ফার্নিচারগুলো তেমন নতুন নয়। এয়ারকন্ডিশন চলছে। বসতে বললেন বস। ভদ্রলোককে প্রথম দেখলো রেজাউল।

তখন টুকটাক নাম ডাক হচ্ছিল কোম্পানির। রেজাউল নামটা শুনে থাকতে পারে। ভদ্রলোককে আগে কখনো দেখেনি।

সাত আট বছর হয় ঢাকা শহরে পা রেখেছে কিন্তু উপর মহলের সাথে তেমন কিছুই জানাশোনা হয়ে উঠেনি। উপরে উঠার অদম্য ইচ্ছেটাই বোধহয় রেজাউলের কম। শৈশব থেকেই সে লাজুক প্রকৃতির। শৈশবেই পিতৃহীন হওয়া এবং অভাব অনটনে বড় হওয়ার কারণে ব্যক্তিত্বটা ঠিক গড়ে উঠেনি। এডুকেশনটাও ঠিকমত পায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়েছে ঠিকই কিন্তু তেমন কিছু শেখা হয়নি সর্বোচ্চ ডিগ্রিটা একান্তই নিজের চেষ্টায় হয়েছে। রেজাউলের একটাই শখ ছিল বই পড়া এবং লেখা। তবে পড়ার প্রতি আগ্রহটাই বেশি। পড়ে পড়ে যেটুকু জানার জেনেছে। ছোটোবেলা থেকেই পত্রপত্রিকা পড়ত প্রচুর। ক্রয় করে পড়ার সাধ্য তেমন একটা ছিল না। তবুও চেষ্টা করত ভালো বই বা পত্রিকা যোগাড় করে পড়তে। রেজাউল ভাবে ওর সন্তানরা যত ভালোভাবে মানুষ হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে অথচ এর হাজার ভাগের এক ভাগও ও পায়নি। পেলে হয়তো জীবনটা অন্য রকম হতো। ওর দু' সন্তান দেশের সবচেয়ে ভালো স্কুলে পড়ে। ইংলিশ মিডিয়াম, ভালো পোশাক পড়ে গাড়ি চরে যায়। আর রেজাউল? মনে পড়ে একবার স্কুলে লুঙ্গি পড়ে গিয়েছিল বলে ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান ওকে ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছিল আর একদিন পাজামা পড়ে স্কুলে গিয়েছিল। এমনকি কলেচে পড়ার সময়ও দু' একবার পাজামা পড়ে গিয়েছে। প্যান্ট বানানোর সাধ্য ছিল না। তো স্কুলে পাজামা পড়ে গেলো ভিতরে জাইঙ্গা ছিল না। দৃশ্যটা একজন বন্ধুর কাছে বিষদৃশ্য লেগেছিল। সেই বন্ধু খুব লজ্জা দিয়েছিল সেদিন। বাড়ি চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। প্রতিমাসে সন্তানদের স্কুলের টিউশন ফি দিতে হয় প্রায় সাড়ে আট হাজার টাকা। অথচ সারাজীবন স্কুলের খরচই বোধহয় এতটাকা লাগেনি রেজাউলের। রেজাউল জানে এই সন্তানরা বড় হয়ে হয়ত একদিন ওদের ভুলে যাবে। আজকালকার ছেলে মেয়েরা খুব প্যাকটিক্যাল ও স্বার্থপর হয়ে বড় হয়। বাবা মাকে অবজ্ঞা করে। পিতৃহীন ছিল বলে অনেক লড়াই সংগ্রাম করে বড় হতে হয়েছে রেজাউলকে।

লাজুক হলেও রেজাউল খুব দুষ্টুও ছিল। সেই দুরন্তপনা যদি এখন থাকত তাহলে হয়তো আরো সফল মানুষ হতে পারতো। রেজাউল শৈশবে হেনো দুষ্টুমি নেই যা করেনি। সিগারেটের প্যাকেট দিয়ে চারা খেলা খুবই মজার ছিল। তখন বৃষ্টল, ক্যাপস্টান, স্টার এসব সিগারেট প্রচলিত ছিল। ঘুড়ি উড়ানো, মার্বেল খেলা, এসব যেমন ছিল তেমনি অন্যান্য খেলাধুলাও করতো। হাইজ্যাম্প, লং জাম্প, দৌড় এসবও খেলতো। স্কুলে বার্ষিক স্পোর্টসে অংশ নিত। খালে, নদীতে ঝাপাঝাপিতে ছিল ওস্তাদ। স্কুল ফাকি দিয়ে নিয়মিত সিনেমা দেখত রেজাউল। মা'র হাতে ধরা পড়ে অনেক মারও খেয়েছে। স্কুলেও স্যারদের বেতের বাড়ি খেতে হতো। রেজাউল অংকও ইংরেজিতে বরাবর দুর্বল। অথব আজকের দুনিয়ায় এ দু'টি ছাড়া বেঁচে থাকাই অর্থহীন। রেজাউলের দুষ্টুমিতে অধৈর্য হয়ে অনেকে রেজাউলের সাথে নিশতে দিতো না। পরবর্তীকালে তাদের অনেকের চেয়ে রেজাউল সফল।

কফির অর্ডার দেয়া হলো। এর আগে ফোনে কথা বলে বেশ ভালো লেগেছে। তবে বয়স যত কম মনে হয়েছিল তত কম না। ভদ্রলোকের বয়স কমপক্ষে আটান্ন থকে ষাট হবে। ছোটখাট মানুষটার। একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন। চোখের নিচে বড় দুটো ডিম ঝুলে আছে। ড্রিংক করেন হয়তো। অত্যন্ত দামী স্যুট পড়ে আছেন। ঘড়িটাও দু' চার লাখ টাকা দাম হবে। এসবই আইডিয়া। ঘড়ির প্রকৃত দাম বোঝা সত্যিই কঠিন। চেহারায় রাগী ভাবটার অন্তরালে অদ্ভুত সারল্য আছে বলে মনে হলো।

- বিয়ে করেছেন?

- জি স্যার।

এসব ক্ষেত্রে স্যার বলতে হয় জানে রেজাউল। পত্রিকা অফিস বসিং ব্যাপারটা নেই। সব ভাইভাই।

- ক' ছেলে মেয়ে?

একটু লাজুক হাসি দিয়ে রেজাউল বলল, এখনো হয়নি তবে হবে।

- গুড। চাকরি করতে চান কেনো সাংবাদিকতাই তো ভালো।

রেজাউলের তখন মরিয়া দসা। পত্রিকার চাকরিটা অনিশ্চিত।

- স্যার বিয়ে করেছি। ওখানে একটু সময় লাগবে।

- আসলে আমি একজন বয়স্ক লোক খুঁজছিলাম যে আমার পিআর দেখবে। আমি কিছু সমাজ কল্যানমুলক কাজ করি। এর আগে একজন ছিলেন, হঠাৎ মারা গেলেন।

- একজন বয়স্ক লোক যেটা করতেন সেটা যদি আমি পারি তাহলে...

একথায় ভদ্রলোক বোধহয় কিছুটা সন্তুষ্ট হলেন।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ নানা বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হয়েছিল। রেজাউল চাকরিটার জন্য বোধহয় একটু অনুনয় বিনয়ও করেছিল। এক পর্যায়ে বললেন, আপনার বয়সটা আসলে খুবই কম। তবুও শেষ পর্যন্ত একটা সিভি রেখে দিলেন। বললেন দেখবেন। তার পিএকে স্পেশাল ফাইলে রাখতে বললেন।

এর পরপরই বস বিজনেস ট্যুরে আমেরিকা চলে গেলেন। মাঝে মাঝে খোঁজ নিত রেজাউল। কিছুটা অনিশ্চয়তাও ছিল হবে কি হবে না। একটানা দু' আড়াই মাস ট্যুর শেষে ফিরলেন দেশে। এসেই রাজনীতিতে নাম লেখালেন। এবং রেজাউলকে খবর দিলেন।

রেজাউল আবার মুখোমুখি হলো বসের। বস আমেরিকা যাওয়ার ঠিক আগেরদিন একটা এসাইনমেন্ট দিলেন রেজাউলকে। সেটা হলো তার সাথে গ্রামের স্কুলে একটি প্রোগ্রামে যেতে হবে এবং পত্রিকায় তার কভারেজ করতে হবে।

- আপনার ক্যামেরা আছে?

রেজাউলের কোনো ক্যামেরা নেই, ক্যামেরা চালাতেও ভালো জানে না তবুও সে বলল, আছে।

- ওয়েল। কাল ঠিক সাতটায় অফিসে আসবেন।

পরদিন যথাসময়ে রেজাউল পৌঁছলো। ঝর্না একটা অটোমেটিক ক্যামেরা যোগাড় করে দিয়েছিল।

প্রথমবার বসের পাশে গাড়িতে চরে বসলো। সেকেন্ড হ্যানড গাড়ি। মাওয়া ঘাট থেকে স্পিডবোট। জীবনে প্রথম স্পিড বোটে চরার সুযোগ পেলো। পরর্বীতে বসের সাথে অনেক দামীগাড়িতে চরা, দামী হোটেলে থাকা, এমনকি বহুবার হেলিকপ্টারে চরারও সুযোগ হয়েছে।

একটি স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রাম সেড়ে দুপুর নাগাদ চলে এলো অফিসে। বস বললেন একটা প্রেস রিলিজ লিখে নিয়ে আসতে। প্রথমবার বসের পছন্দ হলো না। রেজাউল বস বক্তৃতায় যা যা বলেছিলেন তাই কোট করে লিখেছিল, পছন্দ না হওয়ায় নিজের মতো করে লিখলো। বসের এবর পছন্দ হলো। ছবিও ভালোই তুলেছিল। দ্রুত ছবি প্রিন্ট প্রেসরিলিজ লিখে বেড়িয়ে পড়লো। সবগুলো জাতীয় দৈনিকে পাঠালো। এবং পরদিন প্রায় সব কাগজে ছাপা হয়ে গেলো। বস বলেছিলেন এটা আপনার ট্রাইল জব। রেজাউল উত্তীর্ণ হলো। এরপরই দীর্ঘ বিদেশ ট্যুর।

দুরু দুরু বুকেই বসেছিল রেজাউল। পত্রিকার কাটিং কিছু বস আমেরিকা নিয় গিয়েছিলেন, কিছু ফ্যাক্সে পাঠানো হলো। কিন্তু তিনি কতখানি খুশি হয়েছেন সেটা জানা সম্ভব হয়নি। বস প্রথমেই বললেন- কেমন আছ?

- ভালো স্যার, আমার একটি ছেলে হয়েছে।
- কংগ্রাচুলেশন্স।
- থ্যাঙ্কয়্যু।
- কবে জয়েন করবে?
- আপনি যেদিন বলবেন স্যার।
- বুধবার দিনটা আমার জন্য লাকি ডে।
- আমি স্যার বুধবারই জয়েন করতে চাই।

॥ ১৩ ॥

আবার ফিরে আসা যাক পুরনো দিনে। বসের এলাকার একটি বেশ বড় হাট এলাকা। আজ শনিবাল। হাটের দিন। দুর দূরান্ত থেকে অনেক লোকজন এসেছে হাট বাজার করতে। প্রতি হাটে কয়েক কোটি টাকার লেনদেন হয়। খুবই বিখ্যাত হাট। এক নামে সবাই চেনে। সিনেমা হল থেকে শুরু করে তাড়িখানা, বেশ্যালয় সবই আছে। এ এলাকার লোকজন কে বাটপারি'র দিক থেকে পৃথিবী সেরা বলা হয়।

রাত দশটার মত হবে। ভাঙা হাটে ইতস্তত লোকজন ঘোরাঘুরি করছে। কিছু যুবক এখানে ওখানে জটলা করছে। দু' চারটি ভ্রাম্যমান পতিতাও রয়েছে। যুবকদের গা ঘেষে ঘোরাঘুরি করছে। কয়েকটি প্রাইভেট কারও রয়েছে। পাশেই নদী। নদীতে প্রচুর শ্যালো নৌকা দূর দূরান্তে যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে। দুরে হালকা কুয়াশা রয়েছে। আকাশে

একফালি চাঁদও আছে। কখনো মেঘের আড়ালে চলে যাচ্ছে। হালকা শীতের আমেজ। বেশ একটা রহস্যময় পরিবেশ। পাঁচজন যুবক একটি ক্লাবের দোতলায় জরো হয়েছে। আজ একটি জরুরী মিটিং আছে ওদের। হাট থেকে তোলা ওঠানো হয়েছে বেশ ভালোই। বারোটার প্রায় কাছাকাছি। প্রায় পঞ্চাশ বোতল ডাইল (ফেন্সিডিল), ধোয়াওড়া গরুর মাংসের ভুনা, রুটি এবং গোল্ডলীফ সিগারেট। খাওয়া দাওয়া চলবে অনেক রাত পর্যন্ত। পাশের ঘরে দুটো পতিতা মেয়ে অপেক্ষমান। যার যখন দরকার ও ঘরে চলে গেলেই হবে।

পাঁচজনই একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীবৃন্দ। রেজাউলের বসের সমর্থক। তার পার্টির নিবেদিত প্রাণ কর্মী। প্রত্যেকেই রেজাউলের খুব চেনা। এই গ্রপটি প্রকৃতপক্ষে আরো বড় তবে আজ মাত্র পাঁচজন আছে। পলিসি মেকিং-এ এই পাঁচজন অন্যতম। এর মধ্যে একজন বসের সরাসরি বেতনভুক কর্মচারী। রেজাউলই এনেছিল। এর নাম হচ্ছে পগা। অন্য চারজন্য হচ্ছে পাশা, জাহাঙ্গীর, আসলাম, সাগর।

সম্প্রতি পগাএক মেয়েকে কঠিন ছ্যাক দিয়েছে। কলি নামের এই মেয়েটিকে বিয়ের লোভ দেখিয়ে শারীরিকভাবে যাচ্ছেতাই ভোগ করেছে। মেয়েটি পগার প্রেমে পরতে মোটেই রাজী ছিল না। মেয়েটি যথেষ্ট সুন্দরী। ফিগার খুবই আকর্ষণীয়। অস্ত্র ও অন্যান্য ভয় ভীত দেখিয়ে মেয়েটিকে হাত করে। ছয় মাস ভোগ করে ছেড়ে দেয়। মেয়েটি রেজাউলের কাছে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। রেজাউল পগাকে খুবই বকাবকি করেছে। বিয়ে না করলে পুলিশে ধরিয়ে দেবে বলেছে। এর আগেও পগা আরো মেয়েদের সর্বনাশ করেছে। দলবাজী আর খারাপ কাজে পগার জুড়ি নেই। রেজাউল যখন পগাকে পিক করে তখন মনে হয়নি এতটা নোংরা প্রকৃতির হবে। দেখতেও যেমন কুৎসিত কাজকর্মও সেরকমই। আজকের ডাইলের আসরটি কলিকে ছ্যাক দেয়ার সেলিব্রেশনের জন্য করা হয়েছে।

একের পর এক ডাইলের বোতল নিঃশ্বেষ হচ্ছে। ফুরিয়ে যাচ্ছে ভুনা মাংস আর রুটি। সিগারেটের ধোয়ায় ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইতিমধ্যে পাঁচজনই পালাকরে পাশের ঘরে কাজ সেরে এসেছে। প্রত্যেকেই প্রায় বেসামাল।

আসলাম বললো, পগা তোর মালটা বেশ খাসা ছিলো রে।

- মাগীটা বিয়ে করতে চায়। পগা কখনো বিয়ের জন্য মেয়েলোক ধরে না।

পাশা বলল, মোট কতবার?

জাহাঙ্গীর বলল, তার হিসেব আছে নাকি? আমার সামনেই তো একদিনে চারবার হলো।

সাগর বলল, তোকে শেয়ার দেয়নি?

সবাই খুব হেসে উঠলো, পগা ঢুলো ঢুলো চোখে চেয়ে বললো, এবার অই শালার একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

- কোন শালার কথা বলছিস, বললো আসলাম।

- তোর শালার মাথায় আসলেই গোবর। পগার শত্রু তো এখন একটাই।

জাহাঙ্গীর হাতে তুরি মেরে বলল, আসলাম শালা তুই মানুষ হবি না। পগা রেজার কথা বলছে। ওকে সাইজ করতে হবে, না হলে মাল হাতানো যাচ্ছে না।

পগা বললো, আমার অন্য ধান্দা আছে ।

সাগর বললো, আমি জানি ।

- জানিস তো বলিস না কেন, জাহাঙ্গীর ধমক লাগালো সাগরকে ।

আসলাম বললো, পগা রেজার জায়গাটা চায় ।

- এই তো তোর বুদ্ধি খুলেছে বললো জাহাঙ্গীর ।

পগা বললো, শোন শালারা, মন্ত্রী সাহেব আমাদের লোক । ওই শালা অন্য জায়গার লোক হয়ে মাতব্বরি চো... (অশ্লীল ভাষা) ।

আসলাম বললো, ওই কিন্তু তোকে এনেছে । জায়গা দিয়েছে । তোর শালা কি বালডা আছিলো । থাকতি ভাঙা ঘরে, শালা ফকিরনি ।

- তুই চুপ করা শালা । যা বুঝিস না তা নিয়ে কথা বলবি না ।

জাহাঙ্গীরের ধমক খেয়ে চুপ হয়ে গেলো আসলাম ।

- শোন কাল বিকেলে সবাই মন্ত্রির বাসায় আসবি । ওর বিরুদ্ধে কমপ্লেন করতে হবে । ও থাকলে রাজনীতির খুবই অসুবিধা হচ্ছে । শালা বহুত জটিল কেস । ওকে সরাতেই হবে ।

পগার কথায় সায় দিয়ে জাহাঙ্গীর বললো আমার মাথায় আরো আইডিয়া আছে । মন্ত্রী সাহেব সহজে আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না । একটু বকাঝকা করবে ওকে কিন্তু তাড়াবে না । এর আগেও ওর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করা হয়েছে কাজ হয়নি । শালা ম্যানেজ করে ফেলে । ট্যালেন্ট লোক ।

সাগর বললো তাহলে তোর আইডিয়াটা বলে ফেল ।

পাশা অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললো, জাহাঙ্গীর আর আমি প্লান করেছি, প্রথমে মন্ত্রী সাহেবের স্ত্রীকে অর্থাৎ কাকীকে বলবো । তারপর বলবো আপাকে । আপাকে বললে কাজ হতে পারে । কাকা (মন্ত্রী) তাদের কথা ফেলতে পারবে না ।

আসলাম বললো, মনে হয় না কাজ হবে ।

- তুই চুপ কর

ধমক খেযে আসলাম চুপ ।

- আপা সরল মানুষ । তাকে হাত করে ফেলেছি । শীঘ্রই সে একটা কিছু করতে পারবে ।

পঞ্চাশ বোতলের সব শেষ করে সবাই মিলে দুই বেশ্যার ঘরে ঢুকে পরলো । ষড়যন্ত্রের এটাই শেষ নয় । একটি নমুনা মাত্র ।

৷৷ ১৪ ৷৷

একদম শুরুর দিকের কথা । বছরও পার হয়নি চাকরির । বস নতুন নির্বাচিত প্রতিনিধি । ভিতরে আবেগ ভরপুর । প্রতিনিধি হওয়ার আগেও বস দীর্ঘদিন সমাজসেবা করেছেন । এর আগেও রাজনীতিতে আনার জন্য নানা চাপ ছিল, বস আমল দেননি । শেষতক এলেন । বুকে অনেক আশা নিয়ে । নির্বাচিত হলেন, মন্ত্রীসভা গঠিত হলো । কিন্তু বসের নামটি উচ্চারিত

হলো না। মন্ত্রীসভা ঘোষণার সময় অনেকেই টিভির সামনে বসে ছিল। কিন্তু হতাশ হতে হলো। রেজাউলও আশা করেছিল বস মন্ত্রী হলেও হতে পারেন।

নির্বাচনের পুরো তিনটি মাস বসের সাথে চষে বেড়িয়েছে রেজাউল। ঘরে ফিরেছে প্রতিদিন রাত একটা দু'টায়। ঝর্না প্রতিদিন খাবার নিয়ে বসে থেকেছে। দু' বছরও হয়নি রেজাউল বিয়ে করেছে। রেজাউলের ছেলের বয়স ছয় মাস মাত্র। সন্তানের সাথে প্রায় দেখাই হয় না। খুব ভোরে উঠে বেড়িয়ে যেতে হয়। রেজাউল সকালে ওঠে বাসে চরে প্রথমে যায় বসের বিজনেস অফিসে ওখানকার পিআরও সে। দুপুরে পত্রিকা অফিস কিছুক্ষণ, তারপর বিকেলে রাজনৈতিক অফিসে। ঘরে ফিরতে ফিরতে- রাত দশটা। এভাবেই চলতে থাকে জীবন। আর সপ্তাহে অন্তত তিন বার এলাকা সফর। এলাকায় গেলে বসের ছবি তোলা, বক্তৃতা রেকর্ড করা কার কি দাবি দাওয়া নোট রাখা থেকে শুরু করে হাজার লোকের সাথে কথা বলা। ফিরে এসে প্রোগ্রামের কভারেজ দেয়ার জন্য পত্রিকা অফিসে ছোটা। এছাড়াও বসের কোম্পানীর খবরাখবরও পত্রিকায় ছাপার দায়িত্ব তো আছেই।

সাড়ে তিন হাজার টাকা বেতন দিয়ে চাকরি শুরু হয়েছিল। বছর পাঁচেক পিআরও হিসাবে থেকেছিল রেজাউল। রেজাউল পিআরও'র চাকরি থেকে রিজাইন করে যখন অন্য অফিস থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছিল সেখানে বেতন ছিল অনেক বেশি। কিন্তু চাকরিটা করতে পারেনি। নতুন অফিসে যাওয়া শুরু করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হলো না কিছুই।

রেজাউল বসের কোম্পানীর কেউ না হলেও শেষ দিন পর্যন্ত পিআর এর কাজটা তাকে দেখতে হয়েছে। এজিএমের ছবি তোলা থেকে শুরু করে মিডিয়া রিলেটেড কাজগুলো রেজাউলই করেছে। সেজন্য কখনো অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যায়নি।

তবে বসের কোম্পানীর চাকরি ছাড়ার পর থেকে সে অফিসে আর বসতে হয়নি। কালক্রমে রেজাউলের দপ্তরটি বন্ধ হয়ে যায়।

সে সময়ও ঠিক আজকের মতই অবস্থা হয়েছিল। মনে পড়ে রেজাউলের। তখন রাত। কত কথাই স্মৃতির মনিকোঠায় ভেসে উঠছে। ঘটনা তো একটা দুটো নয়। হাজারো ঘটনা হাজারো স্মৃতি। দ্বিতীয়বারের নির্বাচনী প্রস্তুতি চলছে। বসকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক অঙ্গন কিছুদিন আগেও ছিল তোলপাড় করা। বসের দল ক্ষমতাচ্যুত হলো। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এলো। এই সরকারের অধীনেই নির্বাচন হবে। এর ক'দিন আগে মাত্র বসের দল একটি এক দলীয় নির্বাচন করলো। মাত্র ১৫ দিন টিকেছিল সেই সরকার। সেই তথাকথিত নির্বাচনেও বস প্রার্থী হয়েছিলেন।

রাতে বসের গ্রামের বাড়িতে লোকে লোকারণ্য। সবই প্রায় ধান্দাবাজরা জরো হয়ে আছে। থাকবে, যাবে, টাকা নিয়ে ফুর্তি করবে। মদ মাগীবাজী এসব তো আছেই। বস আর কতটুকু কি জানে। তার টাকা কোনো কাজে ব্যয় হয সে খবর না আছে রেজাউলের কাছে। নির্বাচন এলে টাকা পয়সার মাতব্বরিটা অবশ্য বসের দু' একজন আত্মীয় পান। নির্বাচন ফুরোলে অতিরিক্ত বোনাস থাকে তাদের জন্য। রেজাউল বসের সব মিলিয়ে চারটি নির্বাচন করেছে এবং বস জয়ী হয়েছে কিন্তু রেজাউল কিছুই পাযনি।

রেজাউল ধীরে ধীরে বিতর্কিত হয়ে উঠতে লাগল। অফিসেও কেনো যেনো দু' একজন বড় কর্মকর্তারা রেজাউলকে সহ্য করতে পারতো না। অথচ এসব লোকদের সাথে রেজাউলের কোনো কাজও ছিল না। অবশ্য অন্য সবার মতো রেজাউল কাউকে তেল মারা বা তোয়াজ করে চলত না। এটাই ওর জন্য হয়েছে কাল। তাই সুযোগ পেলেই হাতে গোনা দু' একজন রেজাউলের পিছনে লাগতো। এসব লোকদের রেজাউল পছন্দও করতো না। 'বড় সাহেবের' তেল মেরে মেরে এরা এ পর্যন্ত এসেছে। রেজাউল জানে এখান থেকে বের হলে এদের দাঁড়ানোর জায়গা নেই। রেজাউল জীবনে কাউকে কখনো তোয়াজ করেনি এবং করবেও না। এজন্য তার কর্মজীবনে তেমন কিছুই উন্নতি হয়নি। অফিসেই দেখেছে তোষামদই একমাত্র যোগ্যতা। তোষামদকারীদেরই সব সুবিধা দেয়া হয়েছে। বোনাস, ইনক্রিমেন্ট, প্রমোশন সবই।

তো সেই রাতে বস তার গ্রামের বাড়িতে সবার সামনে রেজাউলকে একচোট নিলেন। সামনেই নির্বাচন। মাথা গরম বসের। কেউ কিছু হয়তো বলে থাকবে। খুব হম্বি তম্বি হলো। রেজাউল কিছুই বুঝতে না পেরে বোকা বনে গেলো। রেজাউলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রটা সেই প্রথমবার প্রকাশ্য রূপ নিল।

বসের মাথা গরম হওয়ার আরো কিছু কারণ সেদিনই ঘটেছে। বসের গ্রামের বাড়িটা আরো পাঁচ বছর আগে তৈরি হয়েছে। প্রথম নির্বাচনের সময়, বাড়ি বানানোর সময় যে দু'জন দায়িত্বে ছিল তারা প্রচুর টাকা হতিয়েছে বলে গল্প প্রচলিত আছে। বসের টাকা তার অগোচরে যাচ্ছেতাইভাবে বেরিয়ে যায় কিন্তু চোখের সামনে দিয়ে একটি পয়সাও যেতে পারে না। সে ব্যাপারে বস খুব হিসেবি। পেমেন্টের ব্যাপারে মোটেই উদার নন। তাকে ফাঁদে ফেলে বা প্রেসার দিয়ে যারা আদায় করতে পেরেছে তারাই লাভবান হয়েছে। কাজ দিয়ে বা যোগ্যতা প্রমাণ করে বসের আনুকুল্য পাওয়া খুবই অসম্ভব ব্যাপার। রেজাউল নেহায়েত ঠেকায় পরে দু'চারবার সহযোগিতা নিয়েছে। তারপরও বসের প্রতি রেজাউলের একটা অগাধ শ্রদ্ধা সব সময় কাজ করেছে। বসের বাড়িটা বেশ বড় সর এবং ভালো লোকেশনে। রাতের বেলা মানুষ গিজগিজ করছে। দলীয় কর্মী এরা। সামনের বাংলা ঘরে বসে চা খাওয়া আর গ্যাজানো ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।

ভিতর বাড়িতে সব চেয়ারম্যানরা হাজির। সংখ্যায় এগারো বারোজন হবে। কিছুতেই তাদের বশে আনা যাচ্ছে না, খুব ফাটাফাটি। গরম গরম কথাবার্তা। তারা ইলেকশন না করলে বস ফেল করবে নির্ঘাত এ রকম আওয়াজ দেয়া হচ্ছে। তাদের হাত করতে হলে এবং ইলেকশনে পাশ করতে হলে মাল ছাড়তে হবে। মাল ছাড়া কাজ হবে না। এবং আজ রাতের মধ্যে না হলে সবাই নির্বাচন বয়কটের হুমকি দিয়ে বসল এলাকার মুরুব্বিরা চেষ্টা করেও চেয়ারম্যানদের বোঝাতে পারছিল না। এই চেয়ারম্যানরা গতকাল পর্যন্ত বসের সাহায্য সহযোগিতা নিয়েছে। শুধুমাত্র নির্বাচনের কারণে বেকে বসেছে। বসও জেদ ধরে আছেন। তার বাড়িটি টিনশেডের। দোতালা, বস দোতলায় থাকেন। তিনি নামলেন না। নেমে এলেন তার স্ত্রী। তিনি সাধারণত লোকজনের সামনে বেশি বের হন না। কিন্তু বাধ্য

হলেন। কিম্ভুত কিমাকার চেয়ারম্যানদের মাঝখানে নেমে এলেন। তাদের অনুরোধ করলেন নির্বাচন বয়কট না করার জন্য। শেষ পর্যন্ত গম চোর হিসাবে খ্যাত চেয়ারম্যানদের প্রত্যেককে এক লাখ করে টাকা দিয়ে রফা করা হলো।

তো এ ঘটনার পরপরই রেজাউলের ওপর চরাওয়ের ঘটনা ঘটে। অনেক অভিযোগ ছিল ওর বিরুদ্ধে।

এ গেলো দুটি থানা নিয়ে গঠিত নির্বাচনী এলাকার একটির ঘটনা। পরবর্তী ঘটনা ঘটলো এর অল্প ক'দিন পরই। রেজাউল যে একজন ফ্যাক্টর হয়ে উঠছে তা বুঝতে পারলো ধীরে ধীরে। অন্য এলাকাটিতে ঘটলো আরো বড় ধরনের ঘটনা। সেখানকার সব গুরুত্বপূর্ণ নেতারা একদিন এক হলো। এদের মধ্যে দু'জনকে অন্তত রেজাউল খুবই পছন্দ করে এবং ওর জন্যই এ দু'জন করে খাচ্ছে। লাইসেন্স পারমিট ব্যবসা ইত্যাদি সুযোগ পাচ্ছে। রেজাউলকে কোনো ভাগ দিতে হচ্ছে না। রেজাউল কখনো কারো কাছে ভাগ চায়ওনি। জরুরি মিটিং করলো। তাতে সিদ্ধান্ত হলো রেজাউলকে এমনি সরানো যাবে না। তার বিরুদ্ধে রেজুলেশন আনতে হবে। এবং সই কালেকশন করে বসের কাছে জমা দিতে হবে। কাজটা অনেকদূর আগানোর পরও শেষ পর্যন্ত থেমে গিয়েছে।

বস কেনো রেজাউলকে পছন্দ করে এ কারণেও বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি অভিমানে বসের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিল। এর মধ্যে দু'জন ছিল চেয়ারম্যান। তাদের অভিযোগহলো একজন কর্মচারী হয়ে নেতার পাশে বসে গাড়িতে ঘোরে আর আমরা তার পাশে বসার চান্স চাই না। পরবর্তীকালে রেজাউল ইচ্ছে করেই বসের পাশে অনেক সময়ই বসেনি। প্রয়োজনে আলাদা গাড়ি নিয়ে ট্যুরে গেছে।

বস্তুতপক্ষে মানুষ হচ্ছে ঈর্ষাপরায়ন। এই জিনিসটি বুঝতে রেজাউলের বেশ সময় লেগেছে। সবাইকে রেজাউল সরলভাবে বিশ্বাস করতে চেয়েছে। ভালোবেসেছে। কিন্তু বিনিময়ে ফল হয়েছে উল্টো। প্রবাদে আছে দো পায়াকে উপকার করতে নেই। অর্থাৎ মানুষকে উপকার করতে নেই। কথাটা হয়তো ঠিকই। রেজাউলই দেখেছে অনেকেই বসের কাছ থেকে আনুকল্য গ্রহণ করেছে, বিপদে পায়ে মাথা কুটেছে আবার বিপদ কেটে গেলে অথবা স্বার্থ হাসিল না হলে বিরোধিতা করেছে। যারাই বসের স্বার্থের বিপক্ষে কাজ করেছে বা বস যাদের পছন্দ করেনি তাদের রেজাউল কখনো গ্রহণ করতে পারেনি। ডাবল স্ট্যান্ডার্ড করা শেখেনি রেজাউল। কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা হচ্ছে বস নিজেই তার সিদ্ধান্তে স্থির থাকেনি। আজ যাকে প্রত্যাখ্যান করেছে কালই তাকে বুকে তুলে নিয়েছে। ফলে এই লোকগুলো সুযোগ পেয়েছে রেজাউলের বিরোধিতা করার। বসের কন্যা রাজনীতির জগতে অনুপ্রবেশ করে পুরোপুরি ধান্দাবাজদের খপ্পরে পড়ে গেছে। এমনকি সে তার পিতার আদর্শ অনুযায়ীও চলেনি। সে চলেছে তার দর্শন মতো। রেজাউলকে পর্যন্ত সে সকল অন্যায় মেনে নিতে চাপ সৃষ্টি করেছে। খারাপ ও অসৎ লোকদের প্রাধান্য দেয়ার জন্য বলেছে। যা রেজাউল কখনো মেনে নিতে পারেনি।

॥ ১৫ ॥

বসের নাম হচ্ছে লতিফুর রহমান। আর তার কন্যার নাম হচ্ছে রাজিয়া বেগম। মধ্যবয়স্ক একজন মহিলা। দুই সন্তানের মা। দেখতে সুদর্শন তেমন নয় আবার শারীরিকভাবেও তেমন মজবুত নয়। একটু কুজো মতন। চেহারায় বুদ্ধির তেমন ছাপ নেই। রেজাউলের কাছে কখনোই তেমন আকৃষ্ট মনে হয়নি। তারপরও ধনীদের একটা সুবিধা থাকেই। সেটা রাজিয়া বেগম পেয়েছে। রেজাউল সব সময়ই সুন্দর মানুষদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। পগাও দেখতে বেশ কুৎসিত তারপরও ওর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণ ছিল ওকে দিয়ে গাধার মতো কাজ করানো যেতো। পয়সা দিলে দৌড়ঝাপ করতো। অন্যদের চেয়ে ভালোই করতো। পরবর্তীতে সেয়ানা হয়ে ওঠে এবং অপকর্মে নিয়োজিত হয়।

সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে রাজিযা বেগম পগাকে খুব পছন্দ করে ফেলে। পগাও এটাকে ব্যবহার করে যাচ্ছেতাইভাবে। লোকজনকে ভয়ভীতি দেখাতে থাকে। এমনিতে পগার ফ্যামিলীর কোনো পরিচয়ই নেই। দরিদ্রই বলা যায়। শুরুর দিকে রেজাউল দু' একবার গিয়েছেও। বিভিন্ন কারণে পরবর্তীতে আর যেতে ভরসা পায়নি।

আবু তাহের হচ্ছে লতিফ সাহেবের খুব আস্থাভাজন লোক। তাহের বসের দল করে। তারও ফ্যামিলির পরিচয় বলতে কিছু নেই। লতিফ সাহেবের সব ক'জন প্রিয়ভাজনদেরই রেজাউলের কাছে ফালতু মনে হয়েছে। এদের না আছে শিক্ষা দীক্ষা, না কালচার না কোনো আদর্শ। এরা যে কিভাবে বসের মতো মানুষের প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠে রেজাউলের মাথায় ঢোকে না। আবু তাহের লোকটা নির্লজ্জও বটে। এরা লজ্জা বাপারটাকে দূরে ফেলে দিয়েছে নিজেদের স্বার্থে। লজ্জা নিয়ে থাকলে খাওয়া জোটানো কঠিন। এই তাহেরকেও রেজাউল যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছে। সাহায্য সহযোগিতা পেতে ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি নিজের পকেটের পয়সাই দেয়নি বাড়িতে নিয়ে এসেছে, থাকতে খেতে দিয়েছে। সবই করেছে বসের স্বার্থে। তার লোক ভেবেই করেছে। তাহের সব সময়ই লতিফ সাহেবের সাথে আঠার মতো লেগে থেকেছে। তার স্ত্রীকে মা ডাকতে দ্বিধা করেনি। একদিন হয়েছে কি, তাহের ফোন করেছে রেজাউলের বাসায়। ফোন ধরেছে ঝর্ণা। ও প্রান্ত থেকে তাহের বলে উঠল, আম্মা বলছেন! ঝর্না বললো, আপনি বোধহয় ভুল করছেন, কাকে চান। তাহের বললো, এটা লতিফ সাহেবের নম্বর না? ঝর্ণা বললো, না এটা রেজাউল সাহেবের নম্বর, আপনি কে বলছেন? তাহের নিজের নাম বললো এবং লজ্জিত হয়ে বললো ভাবি আমি ভুল করেছি। সরি। এ থেকেই বোঝা যায় লতিফ সাহেবের কাছে যাওয়ার জন্য এরা হেনো কোনো কৌশল নেই যা অবলম্বন করেনি। এই তাহের রেজাউলকে অনেক ভুগিয়েছে। ওকে প্রতিষ্ঠিত করার পিছনে রেজাউলের বিরাট ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও এসব লোকই রেজাউলকে যন্ত্রণা দিয়েছে। সারাক্ষণ ওর বিরুদ্ধে লেগে থেকেছে।

পগার অবস্থা এমন ছিল খেতে পেতো না। বস তখনও পগাকে ভালো করে চেনেই না। রেজাউলই ওকে চিনিয়েছে, গাড়িতে করে প্রোগ্রামে নিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছে। প্রথম দিকে পগাও যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ছিল। দু' একবার ওর গ্রামের

বাড়িতেও নিয়ে গেছে। একদিন হয়েছে কি পগার বাড়িতে গেছে। ছোট খটো দু' তিনটি রুম নিয়ে একটি ছন্নছাড়া বাড়ি। রেজাউলকে বসিয়ে রেখে পগা কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর খাটো মতন মাংসবহুল এক মেয়ে ঢুকলো ঘরে। বাড়িটা মনে হলো খালি। হাতে ট্রে। কিছু খাবার দাবার। রেজাউল বসেছিল খাটের পাশে। সামনেই খাবারটা রেখে মেয়েটি বলল আমি পগার বোন রেখা। মাংসবহুল হলেও চেহারাটা বেশ মিষ্টি আর কণ্ঠস্বরও আকর্ষনীয়। মনে হলো মেয়েটি গান গায়। চেহারায় সরল্যও আছে। ড্রেসআপ একটু বিপদজ্জনক।

- নিন খান।

- এসব কেনো আনলে।

- আপনি প্রথম এসেছেন। আপনার কথা অনেক শুনেছি পগার কাছে।

- কি বলেছে পগা! খুব খারাপ না!

- যাহ তা বলবে কেনো। খুব প্রশংসা করে। ওর জন্যে অনেক করছেন। ওর জন্য আমাদেরও ভালো হচ্ছে। দাম পাচ্ছি অন্যদের কাছে।

রেজাউল একটু কমলার কোয়া মুখে দিয়ে বলল, পগা গেলো কোথায়?

- একটু কাজে পাঠিয়েছি। দেরি হবে আসতে। আপনার তো তাড়া নেই। খেয়ে দেয়ে যাবেন।

- না না না ওসব করো না।

- না বললে শুনবো না। খেয়ে যেতেই হবে। রান্নার আয়োজন চলছে।

- আচ্ছা তুমি করে বলছি বলে কিছু মনে করো না।

- কি যে বলেন। কিছুই মনে করিনি। আমি আপনার অনেক ছোট।

- তা অবশ্য ঠিক। অনেকে আবার মাইন্ড করে।

- আপনার ক' ছেলে মেয়ে?

- তুমি জানো না?

- পগা বলেছিল, খেয়াল নেই।

- এক ছেলে এক মেয়ে।

- বাহ আপনি খুব ভাগ্যবান।

রেখা মেয়েটি কাছে এসে প্লেটে পায়েস দিতে লাগল। একটু নিচু হওয়ায় বুকের উপরের অংশ বেশ দৃশ্যমান হয়ে উঠল। ঝকঝকে স্তন। রেজাউল একটু শিহরিত হলো। যতটুকু দরকার তরচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে মেয়েটি আপ্যায়ন করছে।

- রেখা তুমি গান কর? রেজাউল একটু খাতির জমানোর চেষ্টা করছে।

- এক আধটু।

- আমার তাই মনে হয়েছিল। তোমার ভোকাল খুব ভাল। গান শোনাবে নাকি?

- যদি থাকেন রাতে শোনাতে পারি।

- রাতে কেনো?

- গান তো রাতেই ভালো ।
- না বাবা রাত পর্যন্ত থাকতে পারবো না ।
- আপনাকে একটা কথা বলি কিছু মনে করবেন না ।
- বলনা ।
- আপনি খুব সুন্দর দেখতে ।
- পুরুষ মানুষের আর সুন্দর অসুন্দর কি । তুমিও কম সুন্দর নাও । আমার খুব ভালো লেগেছে ।

মেয়েটি এ কথায় লাল হলো অথবা ভান করলো । রেজাউলও খুব বানিয়ে প্রশংসা করতে লাগলো ।

- আমি মোটেও সুন্দর নই । কেমন মোটা আর সর্ট দেখতে ।
- ওটা কোনো ব্যাপারই না । তোমার ফিগার তো অসাধারণ ।
- আপনি খুব বানিয়ে বলছেন ।
- বস না । দাঁড়িয়ে আছ কেনো ।

রেখা সঙ্গে সঙ্গে বসলো এবং রেজাউলের প্রায় গা ঘেষে । কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটলো সময় । রেজা কি বলবে বুঝতে পারছে না । বুকের মধ্যে একটু ধুকপুকানি । রেখার গা থেকে মন কেমন করা মেয়েলি ঘ্রাণ আসছে । রেজা বেশ সাহসের সাথে রেখার হাত ধরলো । একটু আকর্ষণ করলো নিজের দিকে । রেখা একেবারে এলিয়ে পড়লো রেজাউলের গায়ে । দু' ঠোঁট ফাক করে তাকিয়ে থাকলো । রেজা রেখার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল মুহূর্তে । রেখা বুকের মধ্যে চলে এলা । রেজাউল বসা অবস্থা থেকে শুয়ে পরলো খাটে । রেখাও । ওর বিশাল বক্ষদ্বয়ের ওপর উঠে গভীরভাবে চুমু খেলো । রেখার তেমন দ্বিধা কাজ করছে না । লো কাটের ব্লাউজের মধ্য দিয়ে স্তন বেড়িয়ে আসতে চাইছে । রেজাকে আকরে ধরেছে । খুব জোরে । ওর শার্টের বোতাম খোলার মুহূর্তে রেজাউল সম্বিত ফিরে পেলো । দ্রুত উঠে বসলো ।

- সরি রেখা ।
- কি হলো!
- ঠিক হলো না বোধহয় ।
- তাতে কি । আমি কিছু মনে করিনি । আজ থাকুন ।
- অন্যদিন । আজ যাই । পগাকে বলো চলে গেছি ।

এ ঘটনার পরও রেখার সাথে দেখা হয়েছে কিন্তু রেখাকে আর সুযোগ দেয়া হয়নি । পরে জেনেছে এরকম অনেকেই ঘটে ওর জীবনে । গ্রামের মেয়েরা শহরের মেয়েদের চেয়েও এসব ব্যাপারে খুব অ্যাডভান্স বলে মনে হলো রেজাউলের ।

॥ ১৬ ॥

পগাও কম যায় না। মেয়ে মানুষ পগার প্রিয় বিষয়। অনেক মেয়ের সাথে সম্পর্ক হয়েছে আবার ভেঙে গেছে। বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সম্পর্ক তৈরি হয় আবার মধু খেযে বিদায়। বসের এলাকার মধ্যে তৌফিক ছেলেটা ভালো। এমনিতে বাইরে ওর সম্পর্কে কিছু রটনা থাকলেও রেজাউল দেখেছে মানুষ হিসাবে ওর তুলনা হয় না। দেখতেও যেমন হ্যান্ডসাম তেমনি সাহসীও খুব। তৌফিককে এক প্রকার বডিগার্ড হিসাবে বসের সাথে লাগিয়ে দিয়েছে রেজাউল। বস মাঝে মাঝে পছন্দ করে আবার মাঝে মাঝে অপছন্দও করে। তবে রাজিয়া বেগম তৌফিককে দুচোখে দেখতে পারে না। এটার কারণ হচ্ছে রেজাউল পছন্দ করে বলে অন্যেরা করে না। বসের এলাকার প্রায় কেউ কারো ভালো চায় না। তৌফিকই একদিন পগার মেয়ে শিকারের কাহিনী রেজাউলকে জানিয়েছে। পগা আর একদিন ওর এক আত্মীয়ের বাসায় নিয়ে গেলো। ছিম ছাম পরিচ্ছন্ন এক বাড়ি। সামনে উঠোন। অবস্থাপন্ন বলেই মনে হয়। পগা চলে গেলো ভিতরে বাড়িতে রেজাউল রইল বাইরের বাংলা ঘরে। শহর থেকে একটু দূরে। যাওয়ার সময় বলে গেলো আপনি গল্প করেন আমি ভিতরে আছি। গল্প করার জন্য একটি মেয়ে এলো। সাথে অনেক পদের নাস্তা। মেয়েটি শ্যামলার মধ্যে হলেও দেখতে বেশ ভালো। রুচিশীল পোশাক আশাক। সাথে ছোট একটি বাচ্চাও।

- আপনার কথা শুনেছি। ভালো আছেন?
- হ্যাঁ ভালো। আপনি ভালো?
- আমাকে তুমি করে বলবেন।
- তোমার ছেলে বুঝি।
- হ্যাঁ।
- বয়স কত।
- তিন বছর।
- খুব কিউট।

মেয়েটি খাবার বেড়ে দিচ্ছিল। পরিবেশটা ভালো লাগল রেজাউলের। মেয়েটি যথেষ্ট দূরত্ব রেখে বসল এবং গভীর মনোযোগ দিয়ে রেজাউলের খাওয়া দেখতে লাগল।

ভিতরের বাড়িতে একটি নিভৃত ঘরে পগা একটি খাটে শুয়ে আছে। খালি গা। একটু পরেই মেয়েটি ঢুকল। এ বাড়িরই মেয়ে। পগার কাজিন। সদ্য বিয়ে হয়েছে। স্বামী প্রায়ই থাকে না। শশুর বাড়িও তেমন যায় না মেয়েটি। শোনা যায় পগার সাথে এই মেয়েটির অনেকদিনের একটা সম্পর্ক ছিল, এখনও আছে। মেয়েটি বিয়ে করতে চেয়েছিল, বিয়ে হয়ে গেলো অন্যত্র।

- আয়।
- না। তোর কাছে যেতে ঘেন্না লাগে।
- তবে এ ঘরে ঢুকেছিস কেনো।
- এমনি ঢুকেছি। এটা তো আর তোর বাড়ি না।

পগা হাসল । শয়তানের হাসি ।

- কিছু খাওয়াবি না । কতদিন পর এলাম ।

- বাইরের ঘরে কে! আপা গেলো দেখলাম খাবার নিয়ে ।

- আমার এক বড় ভাই ।

- কি খাবি বল ।

- না কিছু না । এলাম তোকে দেখতে ।

- ঢং করিস না । তোকে আমার সহ্য হয় না ।

- কেনো কি করেছি ।

- তুই একটা বদমাস ।

মেয়েটি একটি ম্যাক্সি পড়ে আছে । চুলগুলো এলোমেলো । দেখতে ভালো । মুখে কোনো প্রসাধণ নেই । চোখের নিচে একটু কালি পড়েছে । দেখে খুব সুখী মনে হয় না । বয়স বিশ বাইশ হবে । দুই হাতে দুটো সোনার চুরি । ম্যাক্সিটার উপরের দুটো বোতাম খোলা । হয়তো খেয়াল নেই ।

পগা খপ করে মেয়েটির হাত ধরলো । টেনে পাশে বসালো ।

- কতদিন তোকে কাছে পাই না ।

- ছেড়ে দে । আমি এখন বিবাহিত ।

- তাইতো ভালো ।

পগা দু হাত দিয়ে মেয়েটির মুখ তুলে ধরলো । মেয়েটি জোর খাটাল ছোটার জন্য । পারলো না । পগা চুমু খেলো মেয়েটির ঠোঁটে । অনেকক্ষণ ধরে দুঠোট কামরে থাকলো । মেয়েটি ছটফট করেও কাজ হলো না । পগার শক্তির সাথে-পেরে উঠলো না । মেয়েটিকে শুইয়ে দিল । পগা জানে বাড়িতে কেউ নেই এ মুহূর্তে । কারো আসার সম্ভাবনাও নেই । মেয়েটি হার মানলো । সায় দিলো পগার কাছে ।

- ঢাকায় এলে আমাদের বাসায় এসো ।

- আপনিও মাঝে মাঝে আসবেন । আমি আসলে কোথাও যেতে পারি না । আমার হাজব্যান্ড অসুস্থ মানুষ । তেমন কোথাও যান না ।

- কি অসুখ ।

- আছে বিভিন্ন ধরনের অসুখ ।

- তোমাদের বিয়ে হয়েছে কতদিন ।

- বছর চার হবে ।

- তোমাকে যদি আমি এসে বেড়াতে নিয়ে যাই যাবে ।

- আপনি কি আর সময় পাবেন! যা ব্যস্ত মানুষ ।

- তোমার জন্য সময় বের করে নেবো ।

- সত্যি বলছেন ।

- হ্যাঁ ।
- আপনি খুব ভালো ।
- আমি অত ভালো না । আজ যাই ।
- আসবেন কিন্তু ।
- অবশ্যই আসব ।
রেজাউল আর পগা বিদায় হলো ।

॥ ১৭ ॥

তেওফিকের রয়েছে একদঙ্গল বন্ধু বান্ধব । প্রত্যেকেই প্রায় পয়সাওয়ালা । ওর মধ্যে রয়েছে এমনই এক গুণ, যে কেউ সহজে ওকে পছন্দ করে ফেলে । তৌফিকের দরাজ হাত । টাকা পয়সা রাখতে পারে না । আয়ের চেয়ে ব্যয়ই বেশি । স্ত্রীও ছয় বছরের ফুট ফুটে একটি ছেলে আছে ওর । সৎ এবং সাহসী এই দুইটা গুণ রেজাউলের খুব পছন্দ । তৌফিকের এই দুটি গুণই রয়েছে । হাসিখুশি, ভালো গান গাইতে জানে । ওকে পছন্দ না করার কোনো কারণ নেই ।

তৌফিক কখন বসের সাথে এসেছিল বা কে এনেছিল সঠিক মনে না করতে পারলেও অল্প সময়েই রেজাউলের নজরে পড়ে যায় । এবং অল্প ক'দিনেই ওর প্রতি আকৃষ্ট হয় । তৌফিকের আর একটি গুন প্রচুর ড্রিঙ্ক করতে পারে । যতখুশি মদ পান করেও পারফেক্ট থাকতে পারে । কোনো উল্টাপাল্টা হয় না । পগা আবার দু'চোখে তৌফিককে দেখতে পারে না । পগার আবার প্রকাশ্যে বিরোধিতা করার সাহসও নেই । তৌফিককে ঘাটাতে গেলে মার খেয়ে ভর্তা হয়ে যাবে জানে, তারপরও অনেককেই খেপিয়ে তুলেছে এবং বেশ কয়েকবার পাবলিকের প্যাদানিও খেয়েছে । একবার পেদিয়ে হাড্ডি গুড়া করে দিয়েছিল এবং কয়েকদিন হাসপাতালে কাটাতে হয়েছে ।

রেজাউলের মত তৌফিকেরও সমাজের অনেক কিছুর ওপর সুপ্ত ক্ষোভ আছে । অনেক অনাচার আছে যা মেনে নেয়া যায় না আবার প্রতিবাদ করাও কঠিন । সেদিন ওরা দু'জন বসেছিল শেরাটনের বারে । রেজাউল নিয়েছে ব্লাডিমেরি । ওর ফেবারেট ড্রিঙ্ক । ভদকার সাথে অরেঞ্জ জুস মিক্স করে নাও । অসাধারণ ব্যাপার । তৌফিক ব্লাক লেভেল মেরে যাচ্ছিল একের পর এক । তৌফিক আজ খুব মুডে । মনে হয় মানিব্যাগের স্বাস্থ্যও ভালো । তৌফিকই আজ হোস্ট । দু'জনেরই বেশ একটু ধরে এসেছে । একটু পেটে পরলেই রেজাউলের কথা ফোটে । তৌফিক রেজাউলের চেয়ে বয়সে ছোট হলেও রেজাউল ওকে বরাবর আপনি করে বলে । আপনি করে বলতে রেজাউলের খারাপ লাগে না । তৌফিক প্রায়ই রেজাউলকে বস সম্বোধন করে ।

- আসলে হচ্ছেটা কি তৌফিক বলতে পারেন?
- কোন ব্যাপারে বস ।
- মনে হয় সব শালা বাশ নিয়ে বসে আছে ।

- তা তো থাকবেই। আসলে আপনি বস, মাইন্ড কইরেন না একটা ভোদাই। অজাত কুজাতের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন, দোস্ত দোস্ত ভাব করেন। এগুলারে চো... উপরে রাখবেন সব সময়।

- পারি না যে ওস্তাদ!

- বাল পারেন। পারতে অইবে। সব শালা ফকিরনি। রাজনীতি মারায়। মনে করে কি বাল চ্যাট হইয়া গেছে। খোঁজ নিয়া দেখেন খাওন জোটে না। ঘর নাই দরজা দিয়ে শোয়। আমি তো সব খানকির পোলারে চিনি। নিজের এলাকার লোক এরা। আমি হারে হারে চিনি এদের।

- এরা এরকম কেনো? সারাক্ষণ নেগেটিভ চিন্তা। শুধু বাশ দেয়ার জন্য ঘুরে বেড়ায়।

- এটা আমাদের এলাকার লোকদের চরিত্র। অতীত কাল থেইক্যাই হইয়া আসতাছে। সব শালা দুই নম্বর। আমাগো নেতার কাছে আইবো। গলা শুকাইবো। একে অন্যের বদনাম করবো, কিছু ভিক্ষা নিয়া যাইবো। ভিক্ষার টাকা ফুরাইয়া গেলে আবার আইবো। সব শালা চরিত্রহীন। শালারা সবগুলা এক্সপোর্ট কোয়ালিটি।

- আর দেখছেন এদের গেটআপ। চেহারা সবগুলোর চোরের মতো। ছাত্র রাজনীতি করে। মনে হয় দিনভর গাজা খায়।

- নেতা তো আবার এদের কথা শুনে যাফ মারে।

- সমস্যাটাই তো ওখানে। গাজার পয়সা জোটানোর জন্য এরা পারে না এমন কোনো কাজ নেই। তোষামুদি আর তেল দেয়ার ওস্তাদ।

- এজন্যে আপনিও কম দায়ী নন। আপনিই এদের প্রশ্রয় দিয়েছেন। এখন এরাই আপনার... বাশ দেয়ার জন্য উঠে পরে লেগেছে।

- এদের প্রতি করুনা হয়। এরাই ভবিষ্যতে রাজনীতিবিদ হবে। এমপি মন্ত্রী হবে। দেশ চালাবে। হাহ্। কি দুর্ভাগ্য এই জাতির। আচ্ছা তোফিক ভবিষ্যৎ প্রজন্মটা কি এভাবেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে?

- না। আপনার সন্তান তো নষ্ট হচ্ছে না। তাদের আগলে রেখেছেন। ভালো স্কুলে পড়ছে। এক সময় বিদেশ পারি জমাবে। আসলে রাজনীতিবিদরাই পরবর্তী জেনারেশনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে!

- ভালোই বলেছেন তো।

- আমরা নষ্ট হচ্ছি লোভে পরে। মা বাবা খেয়াল করেন না। মনে করে ছেলে রাজনীতি করে, ক্ষমতা আছে। যেভাবেই হোক টাকা পয়সা উপার্জন করছে। চলে যাচ্ছে। সবাই ক্ষমতা চায়। মাস্তান না হলে তো টেকাই মুসকিল।

- ক’ পেগ হলো।

- তৌফিক কখনো পেগ হিসাব করে মদ খায় না। ওয়েটার, ওয়েটার। বসকে আরো একটা ব্লাডি মেরি।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। দু'জনেই বিল মিটিয়ে পার্কিং-এ চলে এলো। রেজাউল ভালো গাড়ি ড্রাইভ করে। পেটে এলকোহল পড়লে ড্রাইভিং আরো স্মুথ হয়। তৌফিক কার সাথে যেনো মোবাইলে কথা বলছে।

- দোস্ত, চল বেড়িয়ে আসি। আজ ফুল মুন। আশুলিয়া যাই। এমন কিছু রাত হয়নি। আরে এক রাত না হয় চাঁদ দেখেই কাটালাম।

কথা শেষ করে তৌফিক বলল, বস চলেন আশুলিয়া যাই।

- এত রাতে!

- আপনিও দেখছি মেয়েলোকের মতো কথা বলেন। পুরুষ মাইনষের আবার রাতই কি আর দিনই কি চলেন তো যাই।

- ওকে!

গুলশান থেকে তৌফিকের বন্ধু সনিয়াকে পিক করা হলো। তারপর তিনজন মিলে আশুলিয়া। এখানে মনটা আচমকা ভালো হয়ে গেলো। দিগন্ত বিস্তৃত ফাঁকা। বর্ষার দিন। পানিতে টইটুম্বুর দু'দিকের জমি। ফুরফুরে বাতাসে নেশাটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। চাঁদের নরম আলো যেনো ঢেলে দিয়েছে পানিতে। বাতাসে ঢেউ এস আছড়ে পরছে তীরে। কুল কুল শব্দ আর চাঁদের আলোয় চিক চিক করছে প্রান্তর। অপূর্ব এ দৃশ্য।

- তৌফিক আপনাকে ধন্যবাদ।

- ওয়েলকাম বস।

- ফাজলামো করছেন।

- না বস।

তৌফিক সঙ্গে সঙ্গে ওর দরাজ গলায় গান ধরলো। 'আসার মাইস্যা ভাসা পানিরে। পূবালী বাতাসে। বাদাম দেইখ্যা চাইয়া থাকি... আমার নি কেউ আসে...।

সনিয়া মেয়েটাও চমৎকার। চাঁদের আলোর রহস্যময়তার মধ্যে মেয়েটিকে অদ্ভুত মায়াবী মনে হচ্ছে। সনিয়াও তৌফিকের সাথে কণ্ঠ মেলালো। ওরা তিনজন একদম পানির ধার ঘেষে বসেছে। দু' চারটে গাড়ি এখনও আছে। পুলিশ পেট্রোল দিচ্ছে। দু' একবার কাছ ঘেষে হেঁটেও গেছে। ট্রাকগুলো হুসহাস। ছুটে যাচ্ছে। বারবার নৈশব্দ ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। সনিয়া যথেষ্ট সাহসী মেয়ে। বড়লোকের মেয়ে। বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু টেকেনি। তৌফিকের সাথে কিভাবে যে বন্ধুত্ব হয় এত লোকের রেজাউল বুঝে পায় না। মাঝখানে সনিয়া, ওরা দু'জন দু'পাশে বসেছে। তৌফিক এক হাত সোনিয়ার কাধে রেখে গান গাচ্ছে। দেখাদেখি রেজাউলও এক হাত সোনিয়ার অন্যকাধে রাখল। সোনিয়া বাধা দিল না।

- খুব সুন্দর না।

সনিয়া কথাটা কাকে বললো বোঝা গেলো না। রেজাউলই উত্তর দিল।

- খুবই। অপূর্ব। এ রকম হুট হাট আসলে বের হওয়া হয় না। আমাদের দেশের প্রকৃতি খুবই অপরুপ। নিজের দেশটাই দেখা হয় না আমাদের।

- আমি বেড়াতে খুব পছন্দ কিরি।

রেজাউল খেয়াল করলো সনিয়ার কণ্ঠস্বর খুবই সুরেলা। এক ধরনের মাদকতা মিশ্রিত। নেশা ধরে যায়। হয়তো নেশা করেছে বলে এ রকম মনে হতে পারে।

- আমিও। আপনি ভার্জিনিয়া গিয়েছেন কখনো!

- হ্যাঁ। খুব সুন্দর। স্বপ্নের মতো শহর।

- ভার্জিনিয়ার সবুজ দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। শহরটাকে মনে হয়েছে একটা আঁকা ছবি।

- আমেরিকার অনেক শহরই এরকম। এই তৌফিক কথা বলছিস না কেনো?

- তোদের কথা শুনছি। বসকে কত বললাম আমাকে আমেরিকা বা কানাডা পাঠিয়ে দেন, বস পাত্তাই দিচ্ছে না।

- বিদেশ গিয়ে কি করবি। আমার তো অস্থির লাগে। কোথাও যেয়ে বেশিদিন থাকতে পারি না।

- আসলে আপনাদের ব্যাপারটা, আমরা যেতে চাই বেঁচে থাকার জন্য। এখানে বেঁচে থাকাই কঠিন।

অনেক রাত পর্যন্ত ওরা চাঁদ দেখলো। গল্প করলো। তারপর এক সময় যে যার ঘরে ফিরে গেলো।

॥ ১৮ ॥

রেজাউল ব্যক্তিগতভাবে একজন সৃজনশীল মানুষ। মানুষকে ভালবাসে। দেশকে ভালবাসে। লেখালেখি করে। সেনসেটিভ মানুষ। অন্যের দুঃখে ব্যথিত হয় উপকারে এগিয়ে আসে। মেয়েদের প্রতি অতিশয় সদয়, শিশুদের প্রতি আরো বেশি। যে কোনো নৃশংসতা অপছন্দ করে। এতোসব সত্বেও নিজের সাংবাদিকতা ও লেখালেখির বাইরে যে কর্মজীবন এতদিন অতিক্রম করলো তা ছিল খুবই নোংরামিতে ভরা, অর্থহীন। জীবনের দীর্ঘ একটি যুগ বলতে গেলে বৃথাই গিয়েছে। এটা ছিল রেজাউলের বেঁচে থাকা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা ছাড়া অর্জনের কোঠা শূন্যে।

এবং শূন্য হাতে ফিরে এসেছে। বসের সাথে দীর্ঘ বারোটি বছর পার করার পরও বিন্দুমাত্র সদয় হয়নি। একবার জানতেও চাননি এরপর কিভাবে চলবে বা কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা। কোনো বেনিফিটও পায়নি রেজাউল। এমনকি চাকরি থেকে ইস্তফা দেয়ার পর একমাস প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে সময় দিয়েছে। বস চেয়েছে রেজাউল যেনো সময় দেয়। চাকরি ছাড়ার অপরাধে একটি মাস মুল্য দিতে হয়েছে।

রেজাউল দীর্ঘদিন একটা ঘোরের মধ্যে কাটিয়েছে। একটা মিথ্যা স্বপ্ন লালন করেছে। বসের জন্য অনেকের শত্রুও হয়েছে। দ্বৈত নীতিতে চলতে বস পছন্দ করতেন। এসব বুঝতে একটু দেরীই হয়েছে। শুরুতে চোখে রঙিন চশমা পরিয়ে দিতেন। রেজাউলও অবশ্য নিজের অস্তিত্বের জন্য কিছু কলা কৌশল অবলম্বন করেছে। না হলে অনেক আগেই ছিটকে পরতে হতো। রেজাউলের জনপ্রিয়তা এমন পর্যায় পৌঁছলো যে রাজিয়া বেগম পর্যন্ত সহ্য

করতে পারলো না । তাকে ইন্ধন যোগালো কিছু স্বার্থন্বেষী লোক । বসও সব বুঝতো কিন্তু সে পালন করলো নীরবতা । দু'পক্ষকেই খুশী রাখার চেষ্টা করার কারণে রেজাউল প্রকান্তরে বলি হলো । আর টাকার ক্ষমতার কাছে রেজাউল হয়ে পড়লো তুচ্ছ । তখন কেটে পরা ছাড়া কোনো গতন্তর ছিলো না । রেজাউলের মত সাধারণ মানুষরা এভাবেই ক্ষমতা আর টাকার কাছে হেরে যায়, ঝরে যায় । অনেক বেদনা বুকে ধারণ করে নীরবে নিভৃতে হারিয়ে যায় । যারা রেজাউলের বিরোধিতা করে সাময়িক লাভবান হয়েছে তারাও একদিন ঝরে যাবে । লতিফুর রহমান আর রাজিয়া বেগমরা প্রয়োজন শেষ হলে ছুরে মারবে আস্তাকুরে । গরীবের কোনো ধর্ম নেই । ওদের লজ্জাবোধও খুব কম । পগার দলরা গু চেটেও খেতে পারে । এদের স্থান সবসময়ই আস্তাকুরই হওয়া উচিত । এরা উচ্ছিস্ট ভোগীর দল ।

কথায় বলে মানিব মান আল্লায় রাখে । অনেক ফটকাবাজ দেখেছে রেজাউল । বন্ধুর বেশে এসেছে । জাকিয়ে বসেছে । বসের হৃদয় কেড়ে নেয়ার জোগাড় । কিন্তু অল্পদিনেই এদের উদ্দেশ্য বস বুঝেছে । ছুড়ে ফেলেও দিয়েছে । একজনকেও প্রকৃত শুভাকাঙ্খী দেখেনি । প্রত্যেকেরই আগমনের পিছনে ছিল একটা উদ্দেশ্য । যে কোন ভাবে কিছু টাকা পয়সা হাতানো । অনেকে সফলও হয়েছে । প্রকৃত বিচারে কেউই প্রায় সম্পর্কটা দীর্ঘায়িত করতে পারেনি । বসও প্রকৃতপক্ষে কাউকে বিশ্বাস করে না, তার বলতে গেলে কোনো বন্ধুও নেই । প্রয়োজনে বন্ধু হয়েছে, প্রয়োজন শেষ, বন্ধুত্বও শেষ । মধুচন্দ্রিমার অবসান । বস এমনই একজন ইনটেলিজেন্ট মানুষ যে কৌশলটা কেউ ধরতে পারে না । তাছাড়া এ টাকার এমন শক্তি যে, যে কেউ বশ মানতে বাধ্য । সমাজটাও এমনই । টাকার কাছে বশ্যতা মানার জন্যই এ সমাজের মানুষ । আর বস কখনো করো কাছে সহজে নত হননি । প্রয়োজন বুঝে সম্পর্কে করেন । তিনি অনেক দেখেছেন । অভিজ্ঞতার একটা দামতো আছেই ।

রেজাউল অনেক সমস্যার সন্মুখীন হয়েছে ঠিকই কিন্তু কেউ সামনা সামনি ওকে কখনো কিছু বলতে সাহস পায়নি । যা কিছু হয়েছে ওর অন্তরালে । প্রাশাদ ষড়যন্ত্র যাকে বলে । ঘরের মানুষ ষড়যন্ত্র করলে কিছু করার থাকেনা । ষড়যন্ত্রকারীদের রেজাউল চিনত কিন্তু কখনো কাউকে বুঝতে দেয়নি । চেষ্টা করেছে ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতে । এই ক্ষমতাটা ওর ছিল বলেই দীর্ঘদিন তাদের উপর দিয়ে হাটতে পেরেছে । এবং শেষ পর্যন্ত সফলও হয়েছে । কেউ ওকে হটাতে পারেনি । ও নিজেই সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বেড়িয়ে এসেছে ।

তবে রেজাউলের বস অনেকভাবে হেনস্থা হয়েছেন । যেভাবে চেয়েছেন সেভাবে পাননি । দীর্ঘদিন মন্ত্রী হয়েও দফতরবিহীন থেকেছেন । মন্ত্রীর সব সুবিধা ভোগ করেছেন কিন্তু জাতির খেদমত করার সুযোগ পাননি । এটাওতো একটা শাস্তি । দলীয় দায়িত্ব কেড়ে নিয়া হয়েছে । প্রচন্ড মানসিক যন্ত্রনায় ভুগেছেন কিন্তু ক্ষমতা ছাড়ার সাহস পাননি । অপমান সহ্য করেও ক্ষমতা আকড়ে থেকেছেন । কারণ তিনি জানতেন ক্ষমতা থেকে সরে এলেই আপদ আসবে । টাকার জোরেও অনেক সময় রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না । এজন্যে কৌশলও দরকার হয় । কৌশলে ভুল হলে তার খেসারত দিতেই হয় । বসকেও দিতে হয়েছে । হয়ত আবার

সব আগের মত হবে। ফিরে পাবেন সব ক্ষমতা। আশা পূরন হবে বসের। রেজাউলও সেই প্রত্যাশা করে। দূর থেকে হলেও বসের মঙ্গল কামনাই করে।

ওরা ক বন্ধু গুলশানের ফিউশনে বসে খাচ্ছিল আর আড্ডা দিচ্ছিল। খেতে খেতেই কত কি ভাবছিল রেজাউল। মজনু, কামাল, প্রদিপ, ডেভিড সবাই এসেছে।

ডেভিড বললো, শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দিলি।

- ছেড়েই ভালো করেছে, কামাল সায় দিল। শালা চাকরি নিয়ে মরতে বসেছিল। চেহারার হাল কি হয়েছিল দেখিসনি।

প্রদীপ নিশ্বাস ছেড়ে বললো, কত স্বপ্ন ছিল তোকে নিয়ে আমাদের। অনেক বছর কষ্ট করলি। তোদের দল ক্ষমতায় আসবে, তোর বস মন্ত্রী হবে। তুই যদি একটা পজিশন পাস তাহলে আমাদের কিছু সুবিধা হবে। সবাই তো কত কি করে। নিজের ভাগ্য গড়ে নিতে হবে। তারতো কিছুই হলো না।

মজনু রেজাউলকে একটা খোচা দিয়ে বলল, কথা বলছিস না কোনো শালা।

- কি বলবো!

- এখন কি!

- কি!

- কি করবি।!

- করবো একটা কিছু। আর যাই হোক টাকা ধার চাইবো না।

- বলেছি নাকি শালা!

রেজাউল ব্যতিরেকে ওরা আর সব বন্ধুই ব্যবসা করে। প্রত্যেকে প্রায় ভালো অবস্থানে আছে। রেজাউল চাকরিটা ছেড়েছে মাত্র। কিছুদিন যাকনা। একটু বিশ্রামেরও দরকার আছে।

ডেভিড বললো, এত তাড়াহুরার তো কিছু নেই। কয়েকদিন আরামসে ঘুমা। বউ বাচ্চা নিয়ে বেড়া তারপর দেখা যাবে।

কামাল বললো তাছাড়া এতদিনের সংযোগ ভুলতেও একটু সময় লাগবে।

রেজাউল বললো, ভোলাভুলির কোন ব্যাপার নেই। মধুর কোন স্মৃতিতো নেই যা মনে থাকবে, যা কিছু স্মৃতি তার সবই আজে বাজে। ওসব মনে রাখার কোনোই কারণ নেই।

মজনু বললো, যা হবার হয়েছে। আমি মনে করি ভালো হয়েছে। ভালো ডিসিশন। ওসব চিন্তা বাদ।

॥ ১৯ ॥

রেজাউল এখন বেশ হালকা। এরপর কি করবে এসব নিয়ে একটু দুশ্চিন্তা আছে ঠিকই তবে আগের সেই মানসিক যন্ত্রনার অবসান হয়েছে। অনন্তকাল পর্যন্ত নতুন একটা চাকরির জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। দু' এক জায়গায় রেজুমি পাঠিয়েছে। রেজুমি পাঠিয়ে চাকরি খুব বেশি যে হয় তাও না। তবুও আশা যে একটা কিছু হবে। চাকরির প্রতি একটা প্রচন্ড

অনীহা থাকা সত্ত্বেও চাকরিই হচ্ছে শেষ ভরসা। বিকল্প হিসাবে ব্যবসা করার জন্য যে পুঁজি প্রয়োজন হয় তা রেজাউলের নেই। কেউ টাকা দিয়ে সাহায্য করবে এমন লোকও নেই। খুব বেশিদিন বেকার বসে থেকে হাওয়া খেয়ে বেড়াবে এমন অবস্থাও নেই। দীর্ঘ বারো বছরে কিছুই সঞ্চয় হয়নি।

রেজাউলের চিন্তা দু'সন্তানকে নিয়ে। ওরা ভালোভাবে বেড়ে উঠুক এটাই ও চায়। এখন পর্যন্ত দু'জনকে নিয়ে রেজাউল ও ঝর্ণা খুব আশাবাদী। পড়াশোনায় ভালো করছে। সাধারণ জ্ঞানও ভালো। রেজাউলের দু'চোখ ভরা স্বপ্ন শুধু ওদের নিয়ে। রেজাউল প্রায় কারো সাহায্য ছাড়াই এ পর্যন্ত পথ পারি দিয়েছে। যে টুকু অবদান ঝর্নার। ঝর্না ওর জীবনে না এলে ইতিহাসটা একটু অন্যরকম হতো। রেজাউলকে পাথের ওপর দাঁড়ানোর জন্য ঝর্না যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত কতটুকু টিকে থাকতে পারবে তা ভবিষ্যত বলতে পারে। রেজাউলের যা চরিত্র তা এই সমাজের হালচালের সাথে বিশেষ খাপ খায় না। এত বেশি মর্যাদাবোধ ওর মধ্যে কাজ করে যে সামান্য কারণেই বিমর্ষ হয়ে পড়ে। এটা ভবিষ্যৎ পথ চলা এবং নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মোটেই অনুকুল নয়।

আজ সারাদিনই রেজাউল প্রায় কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়েছে। সকালে গিয়েছিল শেরাটন হোটেল। ওখানে টপ অফ দ্য পার্কে একটা প্রেস কনফারেন্স ছিল। রেজাউল এখন সাংবাদিকতা ও লেখালেখির ব্যাপারে সিরিয়াস হওয়ার চেষ্টা করছে। পুরনো স্মৃতি আর মনেই করতে চায় না। মাঝে মাঝে কিছু কিছু ঘটনা এসে হানা দেয় মনের মনি কোঠায়। লতিফুর রহমান সাহেবের এলাকার কিছু লোকজন এখনও ফোন করে খোঁজ খবর নেয়। নতুন এপিএস ভালো করছে। সে যথেষ্ট চালাক মানুষ। রেজাউল এটা জেনেই তাকে রিপ্লেস করেছে। লোকজন তাকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে না পারলেও মন্ত্রী সাহেবের কাজের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। রেজাউল মন্ত্রী সাহেবের এলাকার কারো সাথেই সংযোগ রাখতে চায় না। এ পর্যন্ত দু' তিনবার মন্ত্রী সাহেবের ওখানে যাওয়া হয়েছে। স্রেফ তাকে একবার দেখার জন্য। অন্য কোনো ধান্দা নেই। শুনেছে রাজিয়া বেগম এখন দেশে আছে। ধান্দাবাজরা এখন বেশ ফর্মে এবং তৎপর কিছু হাতানোর আশায়। নিজেকে রেজাউলের খুব সুখী মনে হচ্ছে এসব দেখতে হচ্ছে না বলে। রেজাউলের কাছে এসব কর্মকান্ডকে ন্যাকামী ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। লতিফুর রহমানের রাজনীতির ভরাডুবি হবে তার কন্যার কারণেই। সন্তানপ্রীতি এতোটা হওয়া উচিত নয় যা বাস্তব বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করে। এখন পর্যন্ত যতখানি ক্ষতি হয়েছে তার পুরোটাই লতিফুর রহমানের সন্তান ও তাকে ঘিরে রাখা চাটুকারদের কারনে।

রেজাউল সম্প্রতি একটা উপন্যাস লেখায় হাত দিয়েছে। তার সকল অভিজ্ঞতার কথা, লিখে যেতে না পারলে মরেও শান্তি পাবে না। তবে দুঃখ এই যে সব সত্যি কথা লিখতে পারবে না। সত্যকে গ্রহণ করার সৎ সাহস অনেকেরই নেই।

কানাডার ইমিগ্রেশনের নতুন ল' জারি হওয়ায় এই প্রেস কনফারেন্স এর আয়োজন করা হয়। রেজাউল যে ফার্মের মাধ্যমে আবেদন করেছে তারাই প্রেসকনফারেন্সের উদ্যোক্তা। প্রায় সব পত্রিকা ও টিভি মিডিয়ার লোকজন এসেছিল। বিভিন্ন কারণে রেজাউলের

ইন্টারভিউর সময়টা পিছিয়ে গেছে। এটাকে দুর্ভাগ্যই বলা যায়। প্রথমত রেজাউলের ফাইল নয়াদিল্লীতে পাঠানো হয়েছে।। রেজাউল চেয়েছিল আমেরিকার ফাইল পাঠানো হোক। যদিও সেই মুহূর্তে রেজাউলের আমেরিকার ভিসা ছিল না। ভিসা হওয়ার পরপরই যদি ফাইল ট্রান্সফার করা যেতো তাহলেও সময় অনেকটা বেঁচে যেতো। গরিমসি করে করে প্রায় এক বছর পিছিয়ে গেলো। ৯/১১ এর কারনে সারা পৃথিবী তোলপাড় হয়ে ওঠে। সবকিছু বদলে যায়। কানাডা ইমিগ্রেশনের নিয়ম-কানুন কড়াকড়ি তো হলোই উপরন্ত প্রায় ছয় মাস বন্ধ থাকলো ইন্টারভিউ। এই প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমেই শুরু হলো ইন্টারভিউয়ের যাত্রা। তবে নতুন নিয়মে। এতে রেজাউল খুব একটা অ্যাফেক্টেড হবে না। এখন শুধুই অপেক্ষা।

রাতে শেরাটনেই প্রায় ১০/১২ জন সাংবদিক বন্ধু মিলে মধ্যরাত পর্যন্ত ড্রিঙ্ক করা হলো। হোস্ট ছিল রেজাউলের এক বন্ধু।

রেজাউল নিজের দেশের প্রতি এতটা বীতশ্রদ্ধ যে চলে যেতে পারলে বাঁচে। কিন্তু সবকিছু ঠিকঠাক মত হচ্ছে না বলে যাওয়াটা বিলম্বিত হচ্ছে। গতকালের প্রেসকনফারেন্সের পর রেজাউল কিছুটা আশাবাদী হয়ে উঠেছে। হয়তোবা দু' এক মাসের মধ্যেই ইন্টারভিউর ডাক আসবে।

সাংবাদিকতাকে ফুলটাইম করতে চায় না। এজন্য অন্য চাকরির চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে রেজাউল। দুইটি মাস প্রায় জবলেস। স্কুলের পিছনে এ সময়টাতেই প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গেছে। ওদের রেজাল্টও খুব চমৎকার হয়েছে। রেজাউলের উপন্যাসের বিষয়টি অনেকটা নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা হবে। রাজনীতিকে যতটা ঘৃণা রেজাউলের তারচেয়ে বেশি রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে। এদেশের কিছু রাজনীতিবিদদের যদি ফায়ারিং স্কোয়াডে দেয়া যেতো তাহলে দেশটা বাঁচতো।

রেজাউল বরাবর খুব অর্গানাইজ লোক ছিল। এখন অনেকটা ডিস অর্গানাইজ হয়ে গেছে। হঠাৎ ছন্দপতন হওয়ায় কিছুটা এলোমেলোভাব চলে এসেছে। তবে এপিএস হওয়ার পর থেকেই যে টেনশন আর মানসিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল তার কিছুই এখন নেই। নিজেকে বেশ হালকা লাগছে। গত বারোটি বছর রেজাউলের জীবনের কোনো ঠিক ঠিকানা ছিল না। ভীষণভাবে অসামাজিক হয়ে উঠেছিল। কখনো ভোর পাঁচটায় উঠে দৌড়াতে হতো। কখনো ঘরে ফিরতো মধ্যরাত। কোনো ছুটি ছাটার বালাই ছিল না। এমনকি অসুস্থ হওয়ারও কোনো সুযোগ ছিল না। লতিফুর রহমান সাহেব বলতেন তোমাদের এত অসুখ হয় কেনো।

এদেশটা অভাবের। গরীব দেশ। চাকরির জন্য হাহাকার। সুতরাং যতখুশি খাটাও। যার ভালো লাগে চাকরি করবে যার লাগে না করবে না এই হলো চাকরিদাতাদের নীতি। এটাকে অবশ্য নীতি না বলে নীতিহীনতা বলাই ভালো। এখন রেজাউল স্ত্রী সন্তানদের প্রচুর সময় দিচ্ছে। গত এক পক্ষকালের মধ্যে প্রায় প্রতিদিন সবাইকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। দাওয়াত খেয়েছে। অনেকের সাথে দেখা হয়েছে। ভাব বিনিময় হয়েছে। সুন্দর সুন্দর নারী পুরুষ রেজাউলকে মুগ্ধ করেছে। মুগ্ধতার নামই তো জীবন। জীবনভর গোলামী করার মধ্যে

কোনো কৌলিন্য নেই। ঝর্ণা যে চাকরিটা করে সেটাও বেশ ভালো। অত চিন্তার কোনো কারণ নেই।

॥ ২০ ॥

দুটো মাস রেজাউলের এলোমেলো সময় কাটলো। বলা যায় জীবন থেকে আরো দুমাস বৃথা চলে গেলো। এর মধ্যে এক মাস লতিফুর রহমানকে বিনা পারিশ্রমিকে উপহার হিসেবে দিল। এর আগেও একবার এ রকম হয়েছিল। পাঁচ বছর আগে একবার যখন চাকরি ছেড়ে আবার ফিরেছিল, সে সময়ও অন্তবর্তী একটি মাস কাজ করেও পারিশ্রমিক পায়নি। রেজাউল চেয়ে নিতে পারেনি। হাত পেতে নেয়াটা গ্লানির পর্যায়ে পড়ে।

রেজাউলের নিজের জীবনটা নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখেছে। জীবন আসলে কি? এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়? একদিন প্রান বায়ু নির্বাপিত হবে। ঝলমলে এই পৃথিবী থেকে সকল মায়া ত্যাগ করে বিদায় নিতে হবে। ভাবতেও কেমন কষ্ট হয়। মানুষ যতদিন বাঁচে ততদিন সে শুধু পৃথিবীর কাছ থেকে চায়। চাওয়ার কোনো শেষ নেই। যার যত বেশি আছে তত বেশি চায়। এ জগতে হায় সেই বেশি চায়... এ রকম আর কি। যেমন লতিফুর রহমান সাহেব। অনেক বছর পৃথিবীতে বেঁচে আছেন। অনেক দেখেছেন, অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। অনেক পেয়েছেনও। টাকার কুমির হতে পেরেছেন। ক্ষমতাও কম পাননি। তারপরও কি চাওয়ার শেষ আছে! আরো চাই আরো চাই করে তুলকালাম করেছেন। কিন্তু চাইলেই সব পাওয়া যায় না। বেশি চাইতে গিয়ে হারিয়েছেনও অনেক। হয়ত আরো হারাতে হবে। মানুষের চাওয়া সব সময় সীমাহীন। কিন্তু পাওয়াটা তা নয়। একটা পর্যায় পর্যন্ত মানুষ যেতে পারে। এরপরও যেতে চাইলে প্রকৃতি বিরুপ হয়। তখন শুরু হয় বিপর্যয়। লতিফুর রহমান অনেক মানুষকেই সাহায্য করেছেন আবার অনেককে অপমানও করেছেন। সেই অপমানের জ্বালা অনেকেই কোনোদিন ভুলবেন না। মানুষের দীর্ঘ নিশ্বাস খুব সাংঘাতিক জিনিস। অনেকেই নিজের অবচেতন মনে অনেককে কষ্ট দেন। লতিফুর রহমান অহংকারী মানুষ। তিনি জেনে শুনেই মানুষকে অপমান করেন। কাউকে সাহায্য দিয়ে পরক্ষণে অপমানিত করতেও ছাড়েন না। রেজাউল এরকম ভুরি ভুরি ঘটনার সাক্ষী।

যারা ক্ষমতা বা টাকার গরমে সবকিছু করতে চান একদিন তাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। এ রকম নজির এ সমাজে অনেকই আছে। কোথা থেকে পতন এসে হামলে পরবে টেরও পাওয়া যাবে না। রেজাউল জীবন থেকে খুব বেশি কিছু চায়নি। অল্পে সুখী মানুষ রেজাউল। বন্ধুরা প্রায়ই বলে রেজাউল খুব সুখি মানুষ। হয়ত তাই। তবে ছোট ছোট সুখের ঘরে মাঝে মাঝে দুঃখ যন্ত্রনাও হানা দেয়। রেজাউলেরও হয়েছে তাই। ইচ্ছে ছিল লতিফুর রহমান সাহেব যতদিন বেঁচে আছেন তার সাথেই থেকে যাবেন। ঘন ঘন চাকরি বদল রেজাউলের তেমন পছন্দও নয়। অনেক চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানতে হলো। রেজাউল হার মেনেছে নিজের কাছে। নিজের বিবেকের কাছে, নিজের ব্যক্তিত্বের

কাছে। নিজেকে ছোট করতে পারেনি। রেজাউল স্পর্শকাতর মানুষ। এমন সব গুরুত্বহীন লোকজন এমন আচরণ করতে শুরু করলো রেজাউলের অগোচরে যে নিজেকে মানিয়ে নেয়া সম্ভব হয়নি। বস কখনোই রেজাউলকে জোরালোভাবে প্রটেকশন দিতে পারেনি, মাঝে মাঝেই ভুল বুঝেছে। আপমানও কম করেনি, এতসব সত্বেও রেজাউলের প্রতি ভালবাসাটাও ছিল। কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে বস এমন অসহিষ্ণু হয়ে পড়লেন যে, মানিয়ে চলাই কষ্টকর হয়ে পরলো।

রেজাউল মানুষটা বা অন্য আর দশজনের চেয়ে একটু আলাদা। একটু লাজুক। স্পর্শকাতর এবং জেদী স্বভাবের। তবে ওর জেদটা খুব অপ্রকাশ্য। নিজেকে ততটা জাহিরও করতে পারে না। নিজেকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারে না। কোথাও যেনো একটা দ্বন্দ্ব কাজ করে সবসময়। রেজাউলের চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন অনেকেই আছে যারা সমাজে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। নিজেকে জাহির করতে পেরেছে। রেজাউল একটু অন্যরকম। কিছুদিন আগে দেশের একটি প্রথিতযশা সাপ্তাহিকের বিশেষ সংখ্যায় রেজাউলের একটা গল্প ছাপা হয়েছিল। গল্পের পটভূমি ছিল আমেরিকা। সেখানে একটি লাইন ছিল 'একটু অন্য রকম হওয়া খুব কষ্টের'। গল্পটা পড়ে সুইডেনের স্টকহোম থেকে এক মহিলা ফোন করলেন রেজাউলকে। বললেন, আপনার গল্পের একটি লাইন আমাকে খুব স্পর্শ করেছে। এরপর টানা কয়েকদিন ফোনালাপ চললো। একদিন বেশ রাতে সেল ফোনে কথা হচ্ছিল। রেজাউল তখনও ঘরে ফেরেনি। লং ডিস্ট্যান্স কল....

- কেমন আছেন রেজাউল সাহেব।

- ভালো। আপনি এখনও সাহেব বলছেন কেনো। আমি সাহেব নই।

খিল খিল করে হেসে ও প্রান্ত থেকে বেবী বলল, তাহলে কি বলব !

- শুধু রেজা বলবেন। আমার তো আপনাকে তুমি করেই বলতে ইচ্ছে করছে। বলব নাকি!

- আবারও খিল খিল হাসি।

- আপনার হাসিটা খুব মিষ্টি।

- বেবী হাসিতে ভেঙে গুড়িয়ে যাচ্ছে এ রকম।

- এত হাসছেন কেনো? আমি কি হাসির কথা বলছি!

- আপনি খুব চমৎকার মানুষ রেজা সাহেব।

- আবারও।

- ওহ সরি। আর ভুল হবে না।

- তুমি করে বলব নাকি?

- আপনার ইচ্ছে।

- আপনাকেও বলতে হবে।

- না বাবা আমি পারব না।

- এতদূর থেকেও লজ্জা পাচ্ছেন!

- হ্যাঁ, ভীষন। মনে হচ্ছে আপনি আমার খুব কাছেই আছেন।

- হ্যাঁ খুব কাছেই। তবে দেখতে তো আর পাচ্ছেন না। অতএব এত দ্বিধা কিসের!

- আপনি শুরু করুন।

- আপনিও বলবেন তো!

- কথা দিতে পারছি না। চেষ্টা করবো। তবে শোনেন আপনি বা তুমিতে কিছু যায় আসে না।

- ওকে তাহলে আপতত আমিও বলছি না।

- আচ্ছা রেজা, আপনি দেখতে কেমন?

- এটা জেনে আর কি হবে। প্রেম তো আর করছেন না।

- খুব দুষ্টু আপনি। আপনার বউ বাচ্চা আছে না!

- তো কি। আপনার আপত্তি আছে নাকি!

- তা তো আছেই।

- আপনি ফ্রি মানুষ। আপত্তিটা কোথায়।

- শুনুন শুনুন। দূর থেকে খুব বাহাদুরি করছেন। যখন রাজি হয়ে যাবো তখন তো লেজ গুটাবেন। ছেলেদের চেনা আছে।

- এখন ওয়েদার কেমন ওখানে!

- হেসে বেবী বলল, খুব ঠান্ডা, স্নো পড়ছে দু'দিন, এ সময় কি ভালো লাগত জানেন! রুম হিটার চালিয়ে রবীন্দ্রসংগীত শুনতে আর গরম কফি খেতে।

- এবং পাশে যদি প্রিয়জন কেউ থাকে...

- আপনি কি খুব রোমান্টিক মানুষ।

- খুবই। কিন্তু চাকরিটা ছিল কুৎসিত ধরনের।

- কি রকম!

- সরি। দেখবেন একদিন চলে আসবো আপনার স্টক হোমে।

- আসবেন। আমি গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো এয়ারপোর্টে।

- সত্যি বলছেন!

- সত্যি।

॥ ২১ ॥

রোজাউলের চমৎকার একটা চাকরি জুটে গেলো। নির্ঝঞ্ঝাট সাজানো গোছানো অফিসে চাকরি। তেমন কোনো টেনশন নেই। তবে রেজাউলের অপ্রিয় সেই চাকরিতেই ঢুকতে হলো। গত দু'তিন মাস বিজনেস করার কথা কিছু চিন্তা করেছিল। পুঁজি ছাড়া বিজনেস। রেজাউলের কোনো ব্যাংক ব্যালেন্স নেই। কিন্তু টাকা ছাড়া বিজনেস করার জন্য যে ক্যারিসমা দরকার রেজাউলের তা নেই। চাকরি ছাড়ার পর আর একটা চাকরির জন্য বেশ কয়েক জায়গায় ধর্না দিয়েছে। এমনকি চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত ফাইনাল হওয়ার পরও বিভিন্ন

জনের কাছে চাকরির জন্য বলেছে। তারা কেউই প্রায় তেমন আশার কথা শোনাতে পারেনি। রেজাউলের অবস্থা এমন যে একদিনও বসে থাকার উপায় নেই। এ রকম পরিস্থিতিতে হুট করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেশ একটা দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। আর এক নতুন টেনশন শুরু হয়ে গিয়েছিল। এক বন্ধুর সাথে কিছুদিন ঘোরাঘুরিও করলো রেজাউল। তার একটা ঝকঝকে অফিসে আছে। সেখানেই যোগ দেয়ার জন্য বললো। রেজাউলও চেয়েছিল সেখানে লেগে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে বিরত করলো। চাকরিতে ঢুকলে আর বন্ধুত্ব থাকে না। তখন ব্যাপরটা অন্য রকম হয়ে যায়। অবশেষে ঝর্ণার প্রচেষ্টায় চাকরিটা হলো। তার ঘনিষ্ট বন্ধুর স্বামীকে বলে চাকরিটা করিয়ে দিল। বন্ধুর স্বামী খুবই প্রভাবশালী ব্যক্তি। এবারও ঝর্ণা বিপদে ত্রাতার ভুমিকায় অবতীর্ণ হলো। মানুষ হিসেবে তারা দুই জন স্বামী স্ত্রী কতখানি হৃদয়বান ও মহানুভব আজকের এই সময়ে সত্যিই বিরল। নিঃস্বার্থভাবে অন্যের বিপদে এগিয়ে আসার এই প্রবণতা আরো বেশি মানুষের মধ্যে তৈরি হলে সমাজের জন্য মঙ্গলই হবে। ঝর্ণার বাবা মারও কিছু করার ছিল ওদের জন্য। কিন্তু তারা কখনোই সহানুভুতিশীল নয়। রেজাউল জানে না কি কারণে তারা ওর উপর নাখোশ। বিয়ের এতগুলো বছর পার হওয়ার পরও অবস্থার উন্নতি হয়নি বিশেষ। এরকম একগুয়ে মানুষ আর দেখা যায় না। অথচ ঝর্ণা বাবা মা'র একমাত্র কন্যা। রেজাউল জানে বাবা হিসাবে সে কখনো সন্তানের প্রতি এতটা কঠোর হতে পারবে না। ঝর্ণার এটাই অপরাধ সে রেজাউলকে ভালবেসে বিয়ে করেছে। রেজাউলের এতবড় একটা দুঃসময় গেলো অথচ একবারও জিজ্ঞাসাও করেনি। একবারও সহানুভূতি পর্যন্ত দেখায়নি ওর সন্তান বা স্ত্রীর প্রতি। রেজাউলের সাথে তারাতো ভালো করে কথাও বলে না। যদিও এতটা অহংকারী হওয়ার মতো রেজাউল কিছু খুঁজে পায়নি তাদের মধ্যে। দু'জনই খুব অসামাজিক মানুষ। রেজাউল নিজেও কখনো কারও কাছে মাথা নত করেনি, করবেও না। না খেয়ে মরে গেলও না। পৃথিবীতে সবাই মানুষ। সবারই একটা আত্মসম্মান আছে। যে যেমন ব্যবহার করবে সে তেমনই ব্যবহার পাবে। দুর্ভাগ্য রেজাউলের সেও কিছু দিতে পারেনি।

দু'মাস পার করেছে নতুন চাকরির। আস্তে আস্তে এডজাস্ট হয়ে যাচ্ছে। গত দু'মাসে লতিফুর রহমান সাহেব রেজাউলকে বেশ কয়েকবার ডেকেছেন। রেজাউল নিজে থেকেও দু'একবার গিয়েছে। শত হলেও মন্ত্রী মানুষ। রেজাউলের পুরনো বস। দীর্ঘ বারোটি বছর গায়ে গা ঘেষে কাজ করেছে। এত সহজে ভোলা যায় না। মন্ত্রী কন্যার সাথেও একদিন দেখা হয়েছিল। যদিও রেজাউলের কোনো ইচ্ছেই ছিল না ভদ্রমহিলার মুখোমুখি হওয়ার। তারপরও হঠাৎ করেই একদিন দেখা হয়ে গেলো। একটু সৌজন্য সাক্ষাৎ আর কি।

- কেমন আছেন।
- ভালো। আপনি ভালো।
- বাচ্চারা কেমন আছে।
- ভালো।
- কোথাও জয়েন করেছেন।

- হ্যাঁ ।

- কোথায় ।

রেজাউল বললো ।

- কি হিসাবে ।

- ম্যানেজার রিলেশন ।

এটুকুই কথা হলো । সেদিন আর মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে দেখা হয়নি । তিনিই দেখা করতে বলেছিলেন । রাস্তায় যানজটের কারণে সময়মত পৌঁছতে পারেনি রেজাউল । পরদিনই নিজের অফিস ফেলে সকাল সকাল মন্ত্রী মহোদয়ের বাসভবনের এলো । এটাই তার বর্তমান কার্যালয় । মন্ত্রী হলেও তাকে কোনো ধরনের কোনো দায়িত্ব দেয়া হয়নি । অনেক ধরণের দায়িত্ব পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার কথাই তিনি বলেন লোকজনকে কিন্তু অহংবোধ আজ তাকে বহু পিছনে ফেলে রেখেছে । রাজনীতি এমনই এক আজব চীজ ।

যথারীতি স্যুটেড বুটেড হয়ে স্বর্গ থেকে নামলেন । সমাসীন হলেন শরীর ডুবে যাওয়া সোফায় । রেজাউল রুমে ঢুকে প্রায় পুরনো রীতিতে সাজিয়ে রাখা স্টিলের চেয়ারে বসলো । হাত দুটো জারো করে পা দুটি গুটিয়ে যথাসম্ভব সম্মান বজায় রেখে । পুরনো কোনো টেনশন বা ভীতি কাজ করছে না । হালকা ফুরফুরে মন ।

- কেমন আছ ।

- ভালো স্যার । আপনি কেমন আছেন ।

- আমিতো ভালই । কিন্তু দেশটার তো কিছু হলো না ।

- স্যার এ দেশটার আর কিছু হবেও না । এভাবেই চলবে । আপনি চিন্তা করেও কিছু করতে পারবেন না ।

- তোমার কথাই ঠিক । ভালো কিছু করা যাবে না । সুযোগ তো পেলাম না ।

- কেউ ভালো কিছু করতে পারবে না । যে চেষ্টা করবে সেই সাইজ হয়ে যাবে ।

- তোমাকে যে জন্য আসতে বলেছি । টিভিতে একটা প্রোগাম হবে । আমার একটা ইন্টারভিউ নিতে চায় । তুমি উপস্থাপকের বক্তব্য এবং আমার উত্তারটা লিখে দিও ।

- ঠিক আছে স্যার ।

- আর সময় পেলে এসো ।

- আসব স্যার ।

রেজাউল আর বেশিক্ষণ বসতে পারলো না । মন্ত্রী মহোদয়ও উঠলেন । তিনি তার বিজনেস অফিসে যাবেন ।

এর সপ্তাহখানেক পর আবার দেখা হলো মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে । এবার তার বাসভবনে নয় সংসদের অফিসে । যে চেয়ারটায় রেজাউল বসতো সেখানে এখন নতুন এপিএস বসে । এই অফিসটা রেজাউলই সাজিয়েছিল । অনেক দৌড় ঝাপ করে সব যোগাড় করেছিল । বস মন্ত্রী হয়েছেন । তার অফিস হয়েছে । কিন্তু বেশিদিন বসার সৌভাগ্য হলো না । সবই আছে ঠিকঠাক আগের মতো শুধু রেজাউল নেই । পিওন হিসাবে যে ছেলেটিকে রেজাউল চাকরি

দিয়েছিল সেও আছে। তবে পুরনো পরিচিত সবাই রেজাউলকে খুব সম্মান দেখায়। এমনকি বসের এলাকার প্রতিটি লোক দেখা হলেই কুশলাদি জানতে চায়। সেদিন যে মন্ত্রী কন্যার সাথে দেখা হলো তখনও অনেকেই উপস্থিত ছিল। রেজাউল রুমে ঢোকার মুহূর্তে সবাই প্রায় দাঁড়িয়ে পড়লো, ওকে সম্মান দেখালো। নিশ্চয়ই রাজিয়া বেগমের দৃষ্টি এড়ায়নি। রেজাউল যে কারো জন্য ক্ষতিকর ছিল না এটা ঠিকই বুঝতে শুরু করেছে। এই মহিলার কারণেই রেজাউল চাকরি থেকে সরে এসেছে।

এপিএস সাহেব খুব খাতির দেখাচ্ছে। সবসময়ই দেখায়। রেজাউলই এনেছে। লোভনীয় চাকরি। না চাইতেই পেয়েছে। সরকারি বেতন ছাড়াও মন্ত্রী মহোদয় কিছু দেন। এপিএস তাতে খুশি নন। এখন রেজাউলকে এপিএসের বেতন বাড়ানোর জন্য বলতে হবে। প্রতিদিনই একবার করে ফোন করে। তার ধারণা রেজাউল বললেই হবে।

- আমি বললে হবে নারে ভাই।

- হবে। আমি জানি। এখনও দিনের মধ্যে তিনবার আপনার কথা বলেন মন্ত্রী মহোদয়।

- তাতে কি। একদিন আসবে যখন আর বলবে না।

- আপনি ভুলতে চাইলে কি হবে আপনাকে অনেকেই মনে করে। এলাকায় গেলে হাজারো প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

- প্রথম প্রথম একটু হবেই। এটা এমন কিছু নয়।

- আপনি আসলে খুব কঠিন মানুষ ভাই।

- তাও নয়। বাস্তবতাকে মেনে নিতে চেষ্ঠটা করছি।

- বারোটি বছর তো কম সময় নয়।

- ওটাই হলো কথা, সময় একটি বড় ফ্যাক্টর।

ওরা কথা বলতে বলতেই মন্ত্রী মহোদয় তার রুমে ঢুকলেন। রেজাউলও অফিস থেকে এসেছে। সংসদের বাজেট অধিবেশন চলছে। মন্ত্রী সাহেবের সংসদেও কিছু করার নেই বলারও নেই। এমনকি এমপি হলেও কিছু বলতে পারবেন। একজন মানুষ কতটা অসহায় হতে পারেন তার জলন্ত উদাহরণ লতিফুর রহমান। রাজিয়া বেগমের মত মাথা মোটা অথচ নাক উঁচু মহিলারা এই গ্লানিকর অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারছেন কিনা রেজাউল মাঝে মাঝে ভাবেন। নিজের পিতার করুন অবস্থার জন্য যে সেই দায়ী তাও বোধ হয় জানা নেই।

- কেমন আছো।

- ভাল স্যার।

- তুমি ভালো থেকো তাই চাই। তোমাকে সত্যি আমি খুব স্নেহ করি। কে কি বলেছে সেটা কোনো বিষর নয়। তোমার চেয়ে আমাকে ভালো কেউ বুঝতেও পারে না। আমি চাই তুমি আমার জীবনীটা লেখো।

- লিখব স্যার।

- যত সময় লাগে লাগুক।

॥ ২২ ॥

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনটা একটানা অনেকগুলো বছর খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে রেজাউলের। রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের কর্মকান্ড দেখে শুনে রেজাউল খুবই হতাশা। আগামী পঞ্চাশ বছরেও এই দেশটার ভালো কিছু হওয়ার সম্ভবনা নেই। এদেশের জন্য দরকার এখন নতুন নেতৃত্ব। নেতৃত্বের সংকটের কারণে দেশটা জাহান্নামে যাচ্ছে। আগামী প্রজন্মের জন্য একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় অপেক্ষা করছে। সারা পৃথিবী যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন ক্রমশ অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে এই দেশ, প্রিয় বাংলাদেশ।

এদেশের প্রায় প্রতিটি রাজনীতিবিদ অসৎ, অসহিষ্ণু ও কুটিল চরিত্রের। নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছুই চিন্তা করে না। দেশপ্রেম বলে এদের কিছু নেই। একজন সাধারণ কর্মী থেকে শুরু করে বড় বড় সাইজের নেতা পর্যন্ত নোংরামিতে আকন্ঠ ডুবে থাকে। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মানুষ খুন থেকে শুরু করে সবই করতে পারে। যাদের হাতে একটি দেশ পরিচালিত হয়, দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে তারা যদি অসৎ কর্মে লিপ্ত থাকে তাহলে সেই দেশের কোনো সুন্দর ভবিষ্যৎ চিন্তাও করা যায় না। যার ফলে স্বাধীনতার তিন দশকের বেশি অতিবাহিত হওয়ার পরও দেশের কিছুই হয়নি। সাধারণ মানুষের রক্ত চুষে কয়েক হাজার কোটিপতি পয়দা হয়েছে। আর টাকার জোরে এসব লোক যা ইচ্ছা তাই করে। বিবেক, মানবতা ইত্যাদি নির্বাসনে দিয়ে সবাই স্বার্থের পিছনে ছুটছে।

সংবাদপত্রগুলো পর্যন্ত সঠিক খবর দিতে পারছে না। সাংবাদিকরা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। একই দলের দু'জন নেতা দু'জনের প্রতিদ্বন্দ্বী। কেউ কারো চেহারা দেখা তো দূরে থাক, খুন করে ফেলতে পারলে যেনো খুশি। আর চরিত্র হননের প্রচেষ্টা তো সারাক্ষণ চলতেই থাকে। এই হলো বুড়োদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট। আর মাঝারি ও ছোট সাইজের নেতারা এদের অঙ্গুলি হেলনে চলে থাকে। একজন অপর জনের চরিত্র হনন বা কীর্তিকলাপ তুলে ধরার জন্য সাংবাদিক হায়ার করে। সাংবাদিককে পয়সা দিয়ে সবই করানো যায় এদেশে। সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার পয়সার বিনিময়ে দিনকে রাত করে ফেলে। যদি অই রিপোর্টার প্রভাবশালী হয়, উপরের যোগাযোগ ভালো হয় এবং সম্পাদকের পেয়ারের লোক হয় তাহলে সাত খুন মাপ। আর পত্রিকার সম্পাদক বা মালিক পক্ষ সব সময় সবার পক্ষে। পত্রিকার ব্যবসাটাই আগে, সত্যের পক্ষে যাবার চেয়েও। যারা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সহায়তা করে তাদের অপকর্মের কথা পত্রিকা কখনো লিখবে না। এদেশের অনেক শিল্পপতিরাই এখন পত্রিকার মালিক। সবাই যে সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে পত্রিকা প্রকাশ করেছে তা নয়। অনেকেই আছে নিজের প্রভাব বিস্তার, অবৈধ ব্যবসাকে আড়াল করার জন্য পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে।

রেজাউল জানে ওর মতো চুনোপুঠির অনেক কিছু জানা বিপজ্জনক। যত কম জানা যায় এবং যত কম বলা যায় ততই মঙ্গল। এদেশের মানুষের কোনো দাম নেই। সামান্য কারণে খুন হয়ে যায় আদম সন্তান। খুন কারা করায়? নিজেদের স্বার্থের কারণে রাজনীতিবিদদের বা রাজনৈতিক হত্যাকান্ড এদেশে অনেক হয়েছে। আরো অনেক হবে। খুনি কে বা কারা খুন

করায় তা কি অজানা থাকে। পুলিশও সব জানে ওদের মুখ বন্ধ। কত মায়ের সন্তান খালি হয়েছে, খালি হতেই থাকবে।

রেজাউলের স্বভাবটা একটু অদ্ভুত। আজকাল হচ্ছে মেনে নেয়ার যুগ। মেনে না নিয়ে কোনো উপায় নেই। এখন শয়তানদের সময়। তারাই শক্তিশালী। অন্যায়কারীদের রম রমা সময়। অন্যায়ের প্রতিবাদ করোতো মরো। তারপরও রেজাউল জীবনের ঝুকি নিয়ে অনেক কিছু প্রতিবাদ করতে চায় এবং করেও। আবার আপোস রফাও করে ফেলে। বেশি প্রতিবাদী হলে বিপদ হবে। মেরে ফেলবে। ওর সন্তানদের কি হবে এই ভেবে মনের ক্ষোভ মনের মধ্যেই রয়ে যায়। অন্যায় কোথায় হচ্ছে না। অনিয়মের পাহাড় জমেছে। ঘুনে ধরা সমাজ ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশ্বেষ হয়ে যাচ্ছে। কেউ একজন নেই যে, এ সমাজকে এ দেশকে বাঁচাতে পারে। গনতন্ত্রের নামালি গায়ে চরিয়ে যার যা খুশি করে যাচ্ছে। কোনো বিচার নেই, প্রতিকার নেই, জবাবদিহীতা নেই।

অন্যায় দেখতে দেখতে গা সওয়া হয়ে গেছে মানুষের। চলতে ফিরতে অন্যায় দেখতে হয়। কোনো একটা সিস্টেম চালু হলো না দেশটাতে। আইন আছে কাগজে কলমে। কিন্তু তার প্রয়োগ নেই। জোর যার মুল্লুক তার। যে যত ক্ষমতাবান তার দখলেই সব কিছু। রেজাউলের মাঝে মাঝে খুব জ্বালা হয় শরীরের মধ্যে। প্রতিবাদী হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে। কিন্তু একা প্রতিবাদী হয়ে বেঘোরে প্রানটাই যাবে।

সবচেয়ে ভালো হয় নির্বিকার থাকতে পারলে। কিন্তু বিবেকবান মানুষ কতক্ষণ নির্বিকার থাকতে পারে। সবাই মিলিট্যান্ট। টেরোরিজমে বিশ্বাস করে। অন্যায়ের প্রতিকার চাওয়ার কোনো জায়গা নেই। সুতরাং এই যন্ত্রনা নিয়েই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হবে।

তাই রেজাউল ঠিক করেছে সবকিছু স্বাভাবিকভাবে মেনে নেবে। কেউ অন্যায়ভাবে চর মারলেও তাকে সালাম দিয়ে বিদায় হবে। ঘর সংসার আর অফিস এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলবে জীবন। কি দরকার জটিলতার মধ্যে গিয়ে। কিছুই যখন করার নেই তখন সব মেনে নেয়াই ভালো। জীবন চলতে থাকবে তার স্বাভাবিক নিয়মে। বেঁচে থাকাই যখন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

॥ ২৩ ॥

সময় অতিবাহিত হচ্ছে। নতুন চাকরিতে এখনও বড় কোনো অবদান রাখতে পারেনি। চাকরির ব্যপারে খুব সিরিয়াসও নয় রেজাউল। সিরিয়াসনেসের কোনো মুল্যও নেই। বেশি এফিসিয়েন্সি দেখানোর বিপত্তি আছে। ফাঁকিবাজ কলিগরা পেছনে লাগবে। বেশি কাজ বেশি ভুল। যত কম কাজ তত কম ভুল। সুতরাং দরকারটা কি? এখন রেজাউলের একটাই চিন্তা ছেলে মেয়ে নিয়ে বিদেশে পারি জমানো। যদিও রেজাউল জানে বিদেশে তেমন সুখ নেই তারপরও যেতে হবে। কানাডা যাওয়ার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে সেই দেশটার ইমিগ্রেশন ল-এ বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে। পূর্বের চেয়ে কঠিন করা হয়েছে। রেজাউলের ভাগ্যটাই

খারাপ। কিছুটা ওর গাফিলতিও আছে। না হলে এতদিনে ওর চলে যাওয়ারই কথা। এখন নতুন নিয়মের ফাঁদে পড়ে বিলম্বিত হচ্ছে।

রেজাউলের ছেলে মেয়ে পড়াশোনায় ভালো। প্রাইভেট শিক্ষক ছাড়াই দু'জনেরই স্কুলের পরীক্ষার ফলাফল খুব ভালো। ইংরেজিতে চমৎকার। ওদের জন্যই বিদেশে যেতে চায়। দু'জনই ভালো স্কুলে পড়ছে। খরচও প্রচুর যা মোটানো সত্যিই কঠিন হয়ে পড়েছে রেজাউলের পক্ষে। বিদেশ যেতে পারলে যত কষ্টই হোক ছেলে মেয়েদের পড়াশোনাটা ভালো হবে। ওরা মানুষ হবে। ওদের জন্যই এতসব কিছু করা। জীবন ফেনানো, স্বামী স্ত্রীর উদয়াস্ত পরিশ্রম। মোঃপুরের কানাডিয়ান ল ফার্মে ঢু মারলো রেজাউল। গমগম করছে লোকজন। দু'দিন আগেই প্রেস ব্রিফিং এবং সেমিনার হয়ে গেলো নতুন ল' নিয়ে। নতুন নিয়মের ব্যাপারে লোকজন জানতে চাচ্ছে। যাদেরই সামান্যতম সুযোগ আছে সেই চলে যেতে চাচ্ছে। বলা হয় টাকা থাকলে বাংলাদেশ স্বর্গ। কথাটা হয়ত সঠিক। তারপরও অনেক টাকাওয়ালা লোক চলে যাচ্ছে। এদেশের প্রায় সকল রাজনীতিবিদ ও বড় বড় আমলাদের সন্তানরা বিদেশ চলে গেছে। এদের সবারই একটা নিরাপদ ঠিকানা আছে। এদেশ একটা অনিশ্চয়তার দেশ। সামঞ্জস্যহীন দেশ। মানুষের কোনো দাম নেই। তাছাড়া বড় বড় মানুষরা তাদের সন্তানদের নিরাপত্তা ও পড়াশোনার জন্য বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ল'ফার্মের ভিড় দেখে রেজাউলের মনে হচ্ছে কেউ দেশে থাকতে চায় না। অথচ মুসলমানদের বাইরের পৃথিবীতে তেমন দামও নেই। নীল পাসপোর্ট দেখলেই সন্দেহ জাগে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে সন্ত্রাসী হামলা হওয়ায় মুসলমানদের দুরবস্থা বেড়েছে। রেজাউলও তার শিকার। লন্ডন আমেরিকা ঘোরার অভিজ্ঞতা রেজাউলের আছে। অত সুখ কোথাও নেই। নিসঙ্গতা কুড়ে কুড়ে খায়। তারপরও সহজে কেউ ফেরে না। কেনোইবা ফিরবে। এয়ারপোর্ট থেকেইতো শুরু হয় ভোগান্তি। কাস্টমস এরিয়ায় ভোগান্তির শুরু। তারপর প্রতি পদে পদে যন্ত্রনা। পলিউশন, জানযট, লোডশেডিং, ছিনতাই, ডাকাতি এবং খুন।

অফিসের স্টাফরা খুব ব্যস্ত। ওদের বসের সাথে ইতিমধ্যে রেজাউলের একটা বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। মাহফুজা মেয়েটি মিষ্টি হেসে অভ্যর্থনা জানালো। সোফায় বসে বসে দেখছে আর ভাবছে। কবে যে ডাক আসবে ওর সবই এখন ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। আমেরিকায় ইন্টারভ্যূ হবে। সম্ভবত লসএঞ্জেলেস। অনেক খরচের ব্যাপার। চাকরি ছেড়ে দেয়ার পর বেশ একটা চাপে পড়ে গিয়েছিল। সন্তানদের স্কুলের খরচ লেগে গেল প্রচুর। অন্যান্য অনেক অপ্রত্যাশিত খরচ হয়ে গেল। ধকলটা এখনও কাটিয়ে ওঠা যায়নি। তারপরও কায়মনোবাক্যে চাচ্ছে ইন্টারভিউ আসুক। যদিও জানে রেজাউল আরো কয়েকমাস সময় লাগাতে পারে। তারপরও সান্তনা পেতে এসেছে। মাহফুজা খুব ব্যস্ত। এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলো। স্যার কবে যাচ্ছেন কানাডা।

হাসলো রেজাউল। জানে ঠাট্টা করছে। মেয়েদের ঠাট্টা একটু মেনে নিতেই হয়। তার উপর যদি সুন্দরী হয়।

- কই আর যেতে পারছি ।

- পারবেন ।

- কবে যে হবে ।

- হয়ে যাবে । তখন তো আর আসবেনও না, মনেও পরবে না আমাদের কথা ।

হয়ে যাবে শুনে ভালো লাগলো রেজাউলের ।

- আজ খুব ভিড় মনে হচ্ছে ।

মাহফুজা হেসে বললো হ্যাঁ কেউই থাকতে চায় না দেশে ।

- তুমিও চলে যাও ।

- নাহ । আমার হবে না ।

- কেনো ।

- জানেন না এখন অনেক পয়েন্ট লাগে । সতেরো বছর এডুকেশন, ফ্রেন্স জানা, কানাডায় আত্মীয় থাকা, কত কি ।

- তাও ঠিক ।

- আপনার হবে । শুধু সময়ের ব্যাপার । এত তাড়াহুড়ার কি । যতদিন থাকবেন ততই লাভ । দেশে থাকা হলো ।

ঘন্টাখানেক থাকার পর ডাক পরলো রেজাউলের ।

- কেমন আছেন রেজা সাহেব ।

- ভালো, আপনি কেমন আছেন ।

- দেখতেই পাচ্ছেন । সাবাই আমার সাথে কথা বলতে চায় ।

- সেটাতো স্বাভাবিক ।

- সারাদিন বসে আছি এই এক চেয়ারে । আর খবর কি । গার্ল ফ্রেন্ডরা কেমন আছে ।

হাসলো রেজাউল । যা স্ট্রেচ যাচ্ছে, গার্ল ফ্রেন্ডদের কথা মনেও করতে পারছি না ।

- আজ রাতে কাজ কি!

- কোনো কাজ নেই, ফ্রি ।

- অফিসে যান নি ।

- দু'দিন বন্ধ ।

একটু বসুন । বেরোবো ।

রেজাউলের ভালোই লাগছে । তবে নিজের কথাটাই বলা হয় না । বললেই বলবে এত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে । চলেতো যাবেনই । আবার কখনো বলবে যাওয়ার দরকারটা কি ।

সন্ধ্যার পর বারিধারার এক এক্স কর্নেলের বাসায় গেলো । সেখানে এলাহি আয়োজন । আরও পাঁচ ছ'জন নারী পুরুষ এসেছে । গান হচ্ছে । প্রচুর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা । জলসা ঘরের মতো । তিনজন মহিলাই অতীব সুন্দরী, ড্রিঙ্ক করছে সবাই । পোশাক-আসাক বেশ উত্তেজক ধরনের । লো কাট ব্লাউজ । স্তনের উপরাংশ প্রায় দেখা যাচ্ছে ।

রাত প্রায় দেড়টা পর্যন্ত পার্টি চললো। মহিলা ও পরুষরা একে অন্যের খুব ঘনিষ্ট হয়ে আছে। একজন মহিলা যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল রেজাউলের সাথে ড্যান্স করার। রেজাউল কারো সাথেই তেমন মাখামাখি করলো না। তবে আন্তরিকতার ভান করলো। অবশেষে মধ্যরাতে নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে চলে গেলো।

॥ ২৪ ॥

জীবন কোথাও থেমে থাকে না। একদিন যা খুব অসম্ভব বা কষ্টকর মনে হয় সময়ে তা ম্রিয়মান হয়ে যায়। ক্ষত বা ঘায়ের তীব্রতাও এক সময় কমে আসে। একটি ঘটনা অন্য ঘটনাকে ঢেকে দেয়। অনেকটা সংবাদপত্রের খবরের মতো। প্রতিদিন নতুন নতুন ঘটনা। ম্লান হয়ে যায় আগের দিনের ঘটনা। হয়ত ফলোআপ থাকে। তাও একসময় মুছে যায়। মানুষ নতুন ঘটনাই জানতে চায়। তারপরও যার জীবনে ঘটনা ঘটে সেই তা মনে রাখে। সব ঘা কি আর জীবন থেকে মুছে ফেলা যায়।

রেজাউল প্রতিশোধ পরায়ন নয়। অনেকের প্রতিই ওর ক্ষোভ ছিল, আছেও। জেনে শুনে অনেকেই ওর ক্ষতি করেছে। ওকে বিব্রত করেছে। মানসিক যন্ত্রনা দিয়েছে। লোকগুলোকে ওর ভালোই চেনা। ইচ্ছে হয়েছে প্রতিশোধ নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে সংযত করেছে। কারো উপরই কোনো শোধ নিতে পারেনি। নিজের ক্ষতি মেনে নিয়েছে। রেজাউল বিশ্বাস করে একজন কেউ আছে সর্বশক্তিমান। তিনি সব জানেন বোঝেন। হৃদয় দেখে বিচার করেন। মাঝে মাঝে রেজাউল হতোদ্যম হয়ে পড়ে। হতাশা গ্রাস করে। জীবনকে মনে হয় আর্থহীন। আবার শক্ত হতে হয়। বাঁচার জন্য, সন্তানদের জন্য। এই ঘূর্নায়মান অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন এগিয়ে চলে। সাথে সাথে সব স্থবির হয়ে পড়ে। নতুন কোনো ঘটনাই জীবনে ঘটে না। একই রকম। প্রতিদিন সকাল হয়, রাত নামে আবার একটি নতুন দিনের প্রত্যাশা। বড্ড একঘেয়েমী গতানুগতিক। সমাজ, সরকার, সংবাদপত্র এদের উপর ক্ষোভ হয়। এরাই সমাজ বদলাতে পারে। সংবাদপত্রের অসীম ক্ষমতা। মানুষ খুব তাকিয়ে থাকে। সরকারও পারে, পারে রাজনীতিবিদরা সুন্দর বাঁচার নিশ্চয়তা দিতে।

জীবনকে ঘটনাবহুল করা এবং একঘেয়েমী মুক্ত হওয়ার জন্য দরকার অর্থ। অর্থকড়ির ব্যপারে রেজাউল সফল নয়। সব সময় একটা সংকট লেগেই থাকে। এটা ঠিক যে মানুষের চাওয়ার শেষ নেই। এটা রেজাউল বোঝে। ওর অত বেশি কোনো চাহিদাও ছিল না কখনো, অল্পে সন্তষ্ট একজন মানুষ। শুধু এটুকুই প্রত্যাশা ছিল যে, সুন্দর জীবন যাপনের জন্য যেটুকু অর্থ দরকার সেটুকু যেনো থাকে। কিন্তু তা হয়নি। তবে রেজাউল যে ভীষণ কষ্টে আছে তাও নয়। অন্যদের দিকে তাকালে নিজেকে সুখীই মনে হওয়া উচিত। একথা ঠিক যে, যারাই অর্থ সম্পদের মালিক হয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই একটা ইতিহাস আছে। সেটা হচ্ছে পরিশ্রমের ইতিহাস। এমনকি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে যারা তাদেরও একটা ইতিহাস আছে। সাহস ও ভাগ্য তাদের সহায়তা করেছে। তাদের ইচ্ছে ছিল, ড্রাইভ ছিল। রেজাউল

কখনো অর্থ সম্পদের অধিকারী হওয়ার জন্য যতটুকু ড্রাইভ থাকা দরকার তা কি ছিল? বা কতখানি সাহস দেখানোর প্রয়োজন তা কি দেখিয়েছে?

রেজাউল বস্তুতপক্ষে লাজুক প্রকৃতির মানুষ। স্পর্শকাতর। অন্যেরা যা পারে তা ও পারে না। ওর স্বভাবটাই এরকম। নিজেকে কি আর অত সহজে বদলানো যায়? আর সবময়ই নিজেকে একটা ফ্রেশ মানুষ হিসাবে তুলে ধরার প্রবনতা আছে ওর মধ্যে। সমালোচনাকে সহজভাবে নিতে পারে না। যারা সবকিছুকে সহজভাবে নিতে পারে তাদের জন্য জীবনটা অনেক হালকা। রেজাউলের কাছে জীবনটা প্রায়শই জটিল মনে হয় অন্যের আচরণের কারণে। কে কি বললো বা কে কিভাবে ওকে গ্রহণ করলো এটা নিয়ে বড় বেশি মাথা ঘামায়। নিজের প্রশংসাটা শুনতেই যেনো বেশি পছন্দ রেজাউলের। ঘরে বাইরে সর্বত্রই পজেটিভ বক্তব্য আশা করে বসে থাকে। ও যেটা চায় বা যেটা ভাবে সে রকম না পাওয়া গেলে বা সে রকম না ঘটলে ক্ষুব্দ হয়। এ রকমটা ভাবা ওর জন্য বিরাট ক্ষতিকর। রেজাউল নিজের দোষ ত্রুটিগুলো নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছে। নিজেকে গঠনমুলকভাবে পরিচালিত করতে চায়। কিন্তু সবসময় হয়ে ওঠেনা। আত্মসম্মান বা অহংবোধ খুব তীব্র। এমনকি কেউ যদি ওকে তেমন গুরুত্ব না দেয় তাহলেও মনক্ষুনের মত অবস্থা হয়। নিজেকে ইমপর্টেন্ট ভাবার এই প্রবনতা থেকেই ওর কষ্টবোধ অনেক বেশি।

রেজাউল পুরনো চাকরির কথা ভুলতে পারেনা। অনেক স্মৃতি তাড়িত করে। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে। পুরনো বসের অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্বেও মানুষ হিসাবে তিনি অনেক বড়। তার মধ্যে অনেক মহত্ব দেখেছে। তার অনেক বিশেষ গুনাবলী রেজাউলকে বিমুগ্ধ করেছে। নতুন চাকরি অনেক পরিচ্ছন্ন হলেও এখনও ঠিকমত গুছিয়ে নিতে পারেনি, মন ঠিকমত বসেনি। একটা শূন্যতা কোথায় যেনো রয়েছে। মন্ত্রী সাহেব মাঝে মাঝে ডাকেন, রেজাউল নিজেও চলে যায়। অবচেতন মনটাই টেনে নিয়ে যায়। রেজাউলের কিছু চাওয়ার নেই। তারপরও ছুটে যায়। হৃদয়ের ক্ষত গোপন রেখেও আবার সেখানেই ছুটে যাওয়া তাদের মধ্যেই নিজেকে খুঁজে ফেরা। এই অদ্ভুত বৈপরীত্যের কারণেই রেজাউল একটু আলাদা ধরণের মানুষ। আলাদা ধরনের কষ্ট বুকে লালন করে বেঁচে থাকা।

মফস্বল থেকে এসেছিল এক তরুণ। বুকে স্বপ্ন ছিল লেখক হবে। মানুষ তাকে চিনবে। বলবে অইযে যাচ্ছে রেজাউল। রেজাউল এমন এক পরিবারে মানুষ হয়েছে যেখানে কিছুটা সংকট ছিল আবার পরিবারের বেশ নাম ডাকও ছিল। তাই নিজেকে গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়েও দিতে পারেনি আবার আহামরি কিছু হতেও পারেনি। খুব সাধারণ মানের মানুষ হিসাবে বেড়ে উঠেছে। নিজের মত করে বড় হয়েছে, নিজের মত করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যা যা হতে চেয়েছে তার সবটাই হতে পারেনি আবার কিছুটা হয়েছেও। কেউ কেউ ওকে ভাগ্যবান বলে। রেজাউলের মনে হয় ও ভাগ্যবানই। যে পরিবেশ থেকে এসেছে এবং যেভাবে একক মানুষ হিসাবে এগিয়েছে তাতে নিজেকে ভাগ্যবানই মনে করা উচিত।

কয়েকটি কারণে রেজাউল বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞ। এক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন, বিখ্যাত মানুষদের সাথে পরিচয়, সাংবাদিকতা ও বইলেখা, বিখ্যাত লোকের অধিনে চাকরি এবং ইউরোপ আমেরিকা দেখার সৌভাগ্য ও দুটি প্রতিভাবান সন্তানের বাবা হওয়া।

প্রতিদিনই ভাবে জীবনটাকে ঢেলে সাজাবে। ছক বাধা জীবন থেকে বেড়িয়ে আসবে। মাঝে মাঝে ভাবে টাকার পিছনে ছুটবে। টাকা অনেক সমস্যার সমাধান এনে দেয়। টাকা বন্দুকের চেয়েও শক্তিশালী। কখনো ভাবে সিরিয়াসলি লেখালেখি করবে। নাটক, গল্প ও উপন্যাস লিখবে প্রচুর। কখনোভাবে বিখ্যাত সাংবাদিক হবে। সবাই লেখা পড়বে। যে স্বপ্ন নিয়ে মফস্বল থেকে এই নগরীতে বুকে পা রেখেছিল। কি জানি কি স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল আর কতটুকু পূরণ হয়েছে। কলেজ জীবনে একটি মেয়েকে খুব পছন্দ ছিল। বিয়ে করার কোনো স্বপ্ন ছিল না। এমনি এমনি ভালো লাগতো। চমৎকার বন্ধুই বলা যায়। যে ওকে বুঝত বা বোঝার চেষ্টা ছিল।

রেজউলের স্ত্রী চমৎকার একটি মেয়ে। ওকে সত্যিকার ভালোবেসেই বিয়ে করেছে। অসাধারণ তার ত্যাগ। আজও রেজাউল টিকে আছে ঝর্না নামের মেয়েটির জন্য। বার বার ঝর্নার কাছেই ও আশ্রয় পায়। রেজাউলের ঝর্না ছাড়া আর যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। দুটি অসাধারণ সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে এই মেয়েটি। রেজাউলের জাগতিক সমস্ত দুঃখ ঘুচিয়ে দেয় ওর ছেলে ও মেয়ে। ওরা দু'জনই বেচে আছে বেঁচে থাকবে ওদের জন্য। হাজার বছর আয়ু প্রার্থনা করে যাবে ওরা দু'জন। সন্তানের ভিতর দিয়ে বেঁচে থাকবে রেজাউল। জীবনের এই প্রান্তে এসে শুধু ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে থাকবে। ওরা নতুন কিছু করবে। সুন্দর পৃথিবী গড়বে।

(সমাপ্ত)

(এই উপন্যাসের সব ঘটনা ও চরিত্রই কাল্পনিক। বাস্তবের সঙ্গে কোথাও কোনো মিল খুঁজে পেলে তা নিতান্তই কাকতালীয় -লেখক)